৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৪২৬

গোয়েচা লা ট্রেক - জোংরি থেকে কোকচুরাং-এর পথে - আলোকচিত্রী শ্রী সুদীপ্ত ঘোষ

বেড়ানোর কথা
আর ছবি নিয়ে
বাংলা
ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

~ ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা - বৈশাখ ১৪২৬ ~

খুব গরম। ঘামতে ঘামতে সম্পাদনা করছি একের পর এক লেখা। চোখে পড়ল সূর্যাশিস পালের ছোট্ট ভ্রমণকাহিনি ভরতপুরকে নিয়ে। মনে পড়ে গেল, ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস।

আগ্রা থেকে বেরিয়ে ফতেপুর সিক্রি দেখে ভরতপুর পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। পরেরদিন আবছা কুয়াশায় মোড়া ঠান্ডার এক সকালে রিক্সাওলা বীরু সিং আমাদের পাখি চেনাতে চেনাতে নিয়ে চলেছে। কুয়াশা কেটে ক্রমশ শীতের নরম রোদ্দুর উঠল। গাছের ডালে ছোট্টখাট্টো স্টার্লিং-এর চঞ্চলতা নজরে পড়ছিল। টিয়ার ঝাঁক একেকটা গাছের ন্যাড়া ডালকে বেশ সবুজ করে রেখেছিল। ঝোপের মাথায় ল্যাজতোলা রবিনও চোখে পড়ছিল মাঝে মাঝেই। কোথাও দূরে পেখম ঝুলিয়ে আলস্যে ময়ূর। ইন্ডিয়ান রোলার বা নীলকণ্ঠ পাখি শুনেছি নাকি আজকাল খুব সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। দেখা মিলছিল রঙিন ছোট্ট এই পাখিটিরও থেকে থেকেই, একেবারে না খুঁজেই।

রিক্সা থেকে নেমে রাস্তার পাশের বাধা টপকিয়ে জঙ্গলের মাঝে পায়ে চলার সরু কাঁচা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে কত যে পাখির কলকাকলি কানে আসছিল কী বলব! জঙ্গলের মধ্যে নজরে এল মগডালে ঈগল বসে রয়েছে শিকারের প্রতীক্ষায়। পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোতে গিয়ে দূর থেকে আমাদের দেখে বিস্মিত চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে পথের ওপর দাঁড়িয়েই চেয়ে রইল চিতল হরিণ। কাছে আসতে দেখে পা চালিয়ে এগিয়ে গেল ময়ূরের দল আর বুনো শুয়োর তার ছেলেপুলেদের নিয়ে। আরও এগোতে বড় এক জলায় নানান জাতের পাখির ভিড় - পেন্টেড স্টর্ক, পার্পল হেরন, ইগ্রেট - আরও কত কী। সাদায়-কালোয় মেশানো নাইট হেরন গাছের ডালে চুপটি করে বসে আপনমনেই। এরই আরেক জাতভাই ছাই রঙা হেরনও পরে চোখে পড়েছিল ঘাসজমিতে। আর জলার ধারে পন্ড হেরন।

ফিরে এসে আবার রিকশা করে মূল রাস্তায় যেতে যেতেই জলার দিকে তাকালে চোখে পড়ছিল নানা ধরণের স্টর্ক, কমন কুট, ডার্টার, আইবিস, করমোরান্ট বা পানকৌড়ি। কোথাও ঘাসজমিতে এলোমেলো পায়ে খাবার খুঁজে ফিরছে মুরহেনের দলবল। জলার মাঝে মাঝে ছোট দ্বীপের মতো জেগে থাকা চড়ায় বাবলা জাতীয় গাছ, তার ডালে পেন্টেড স্টর্কদের বাসা। গাছের ডাল থেকে গম্ভীর মুখে গোল গোল চোখে আমাদের নিঃশব্দে জরিপ করছিল একটি স্পটেড আউল। খানিকদূর যেতে ডানহাতে পড়ল সেলিম আলি ভিজিটর ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার। আর তার পাশে স্যুভেনির সপ। বাঁ হাতে জলার মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে খাবার খুঁজতে ঘুরে বেড়াচ্ছে লম্বাগলা বকের দল - ছোট ও বড় প্রজাতির ইগ্রেট। বড় প্রজাতিটির সাদা গায়ে আবার জায়গায় জায়গায় কালো রঙের পোঁচ। চেনা তিতির, ময়না, রেড ভেন্টেড বুলবুল, কাঠঠোকরার পাশাপাশি একসঙ্গে এত অচেনা পাখি চিনেছিলাম যে এদ্দিন পরে লিখতে বসে সবার নাম আর মনে পড়ছে না। যাওয়ার পথে এক জায়গায় জঙ্গলের ভেতরে চোখে পড়ল একটা বুনো শুয়োর মরা হরিণ ভোজনে ব্যস্ত।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার শেষপ্রান্তে ওয়াচ টাওয়ার। রিকশা বাঁ হাতে বেঁকতেই এবারে টানা শুধু জলা। জলার মধ্যে নানা জাতের হাঁস, মাছরাঙা। কত প্রজাতির হাঁস – স্পট বিলড ডাক, র‍্যাডিশেল ডাক, পিনটেল, বার হেডেড গুজ, হাঁসের দলের মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে পানকৌড়িরাও। দূরে এক ছোট্ট দ্বীপে হাঁসেদের মাঝে বসে এক ডালমেশিয়ান পেলিকান। জলার পাড়ে ওয়াচটাওয়ারে উঠি। শীতের ছোট দিনে পড়ন্ত বিকেলের আলো এসে পড়েছে জলে। মাথার ওপর দিয়ে আওয়াজ করে পাখির দল উড়ে যাচ্ছে যেন বলতে বলতে, 'পাহাড়তলি কে যাবে? পাহাড়তলি!'

অমনি খেয়াল পড়ল আরে কোথায় শীতের বিকেলশেষের ভরতপুর, আমি তো ঘোর গরমের দুপুরে কলকাতাতেই! আশা করি পাঠকদেরও 'আমাদের ছুটি'-র এই সংখ্যার লেখাগুলি অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে নিয়ে যেতে পারবে। ভালো থাকুন সকলে।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"রাস্তা বেজায় উঁচু নীচু ব'লে আমরা পরস্পর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে পড়তে লাগলাম। দেখতে ভারী মজা লাগছিল - কেমন ক'রে মাঝে-মাঝে একজন হেল্‌তে-দুল্‌তে অতি কষ্টে চড়াইয়ের উপর উঠ্‌ছে আবার সমুদ্রের জাহাজের মতন প্রথমে পিছনের চাকা, কম্বল, পরে পিঠ ও শেষে টুপি অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে।"

- শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে "সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত"

~ আরশিনগর ~

বিদায়বেলায় বাঁকুড়ায় - তপন পাল

পুরুলিয়ার পথে পথে - মলয় সরকার

তিনচুলেতে তিনদিন - মালবিকা ব্যানার্জ্জী

~ সব পেয়েছির দেশ ~

গোয়েচা লা-র পথে - সুদীপ্ত ঘোষ

মানালির ডায়েরি - কৌস্তভ মজুমদার

নীলাকুরিঞ্জির খোঁজে - গার্গী মন্ডল

চতুর্থ কেদার -রুদ্রনাথ -সুমন্ত মিশ্র

~ ভুবনডাঙা ~

পুরাভিদা কোস্টারিকা – শ্রাবণী ব্যানার্জি

বর্ণময় প্রাগ – কণাদ চৌধুরী

~ শেষ পাতা ~

ভরতপুরে একদিন – সূর্যাশিস পাল

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - 2019 **AmaderChhuti.com ● Web Design: Madhuwanti Basu**

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ তাই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

['সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত' -এই ভ্রমণকাহিনিটি ধারাবাহিকভাবে বেরোত প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিচিত কোনও নাম নয়। আজকের ইন্টারনেট-গুগুল ম্যাপ-ইন্সটাগ্রাম-ফেসবুক লাইভ যুগের তরুণ-তরুণীদের জন্য এখানে রইল প্রায় একশো বছর আগের কয়েকজন অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বাঙালি তরুণের ভ্রমণকথা।]

সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

বিহার

২৬শে সেপ্টেম্বর, শনিবার - সকাল ৬টায় রওনা হ'লাম। দূর থেকে ট্রাঙ্ক রোড বড় বড় গাছের সারির মধ্যে যেন একটা প্রকাণ্ড অজগরের মতন দেখাচ্ছে। মাইল আট আসার পর বরাকর নদীর পুলের ওপর এসে পড়লাম। এখানকার দৃশ্য বেশ সুন্দর। রাস্তার দু'দিকে যতদূর দেখা যায় বেশ ফাঁকা, মাঝে-মাঝে শাল-পলাশের বন আর দূরে নীল পাহাড়ের সারি। বরাকর নদী বাংলা ও বিহারের সীমানা। নদীর এপারে এসে আমরা বাংলা মাকে নতি জানিয়ে কিছুদিনের মতন বিদায় নিলাম।

দৃশ্য ক্রমেই বদ্‌লাতে সুরু হয়েছে। ঢেউ-খেলানো রাস্তার ওপর দিয়ে অতিকষ্টে সাইকেল চালাচ্ছি। আর বাংলার সেই আকাশতলে-মেশা হরিৎক্ষেত্র নেই, রাস্তার পাশের বাঁশ ঝাড় ও নারিকেল-গাছের শ্রেণীও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। লাল রঙের মোটা থানের কাপড় পরা বিহারী মেয়েরা কোথাও কুয়া থেকে জল তুলছে, কোথাও বা পুরুষদের সকল কাজে সাহায্য কর্‌ছে। শক্ত মাটির মেয়ে ব'লে শক্ত কাজের মধ্য দিয়েও এদের স্বাস্থ্য হ'য়েছে অটুট।

ঘন্টাখানেক পর নির্সাচটী ব'লে একটা ছোট চটীতে পৌঁছলাম। চটীর সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়। এখানকার একমাত্র বাঙ্গালী শ্রীযুত তিনকড়ি দত্ত মশায়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল ও এইখানে প্রাতরাশ সারা গেল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে বরাবর পাঞ্জাব অবধি আট দশ মাইল অন্তর চটী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। চটীতে মোটামুটী রকমের খাওয়া-দাওয়ার জিনিষ-পত্র মেলে ও ভাল জলের বন্দোবস্ত আছে। এছাড়া রাস্তার ধারে ধারে কিছুদূর অন্তর কুয়াও দেখা যায়। প্রত্যেক চটীতেই প্রায় পনেরো ফিট উঁচু দুটি স্তম্ভ থাকে। এইগুলিই চটীর নিদর্শন ও এদের নাম 'কোশমিনার'। এইসমস্ত সেরশা'র অমর কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

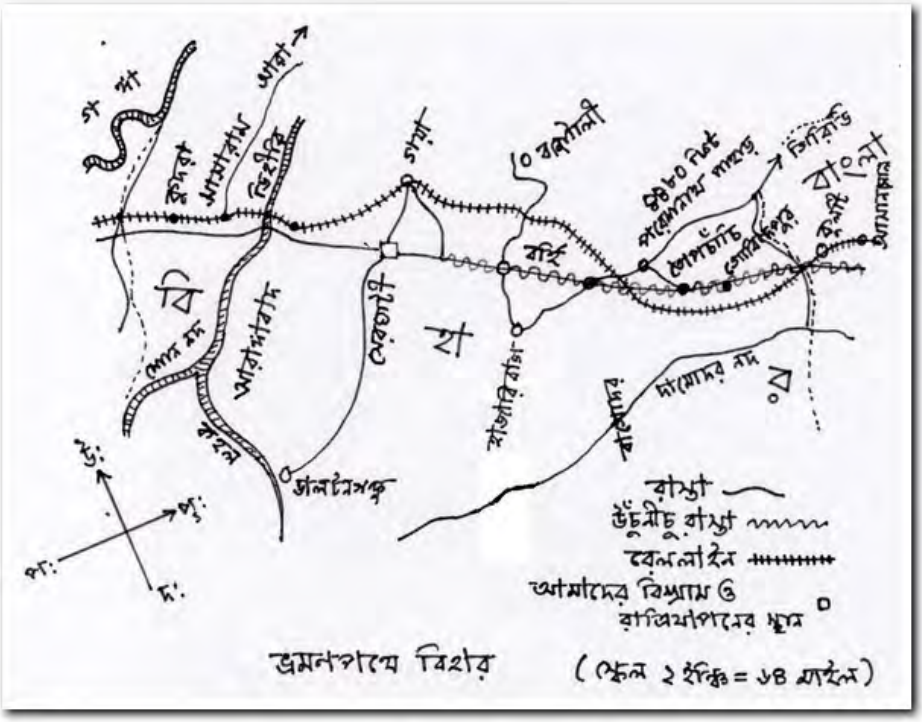

এই অঞ্চল থেকে রেলওয়ে দূর ব'লে চটীগুলির প্রয়োজনীয়তা বেশ অনুভব করা যায়। সেইজন্যে এই-গুলির অবস্থা পূর্ব্বের মতই আছে। কিন্তু যেখানে রেল, কার্‌খানা বা অপর কোনো কারণে রাস্তার আশে-পাশে সহর গ'ড়ে উঠেছে সেখানে এরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। কেবল কোশমিনারগুলি অতীতের চিহ্ন-স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

পোষ্ট অফিস থেকে বেরুতেই দেখি পুলিশ হাজির। নাম ধাম অন্য খোঁজ-খবর দিয়ে রওনা হ'য়ে পড়লাম। রাস্তায় বেরিয়ে পুলিসের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। তখন বেলা প্রায় আটটা। রোদ বেশ চন্‌চনে। রাস্তাও অসম্ভব রকমের উঁচু নীচু। ছোট ছোট চটীতে ঘন ঘন জল খাওয়া ও বিশ্রাম নেওয়া সুরু হ'ল। মোটরের টায়ার ফাটাতে এক সাহেবকে বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়তে হ'য়েছে। রোদে তার অবস্থা আমাদেরই মতন। আটাশ মাইল আসার পর গোবিন্দপুরে পৌঁছলাম। পোষ্ট আফিস, থানা ও ডাক্তারখানা ছাড়া পাকা বাড়ী দু'চার খানা আছে। খাবারের দোকানে পুরী ভাজার গন্ধে ক্ষিদেটাও বেড়ে উঠ্‌ল। জায়গাটি বেশ ছায়া-ঢাকা ও খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা হবে ব'লে এইখানেই এবেলার মতন ছাউনি ফেলা গেল।

এখানকার বাঙালী ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'তে দেরী হ'ল না। তাঁর বাড়ীতে চা খাওয়ার পর ট্রাঙ্ক রোডের বাঁদিকে পুরুলিয়ার রাস্তার ওপর একটি বড় পুকুরে স্নান করা হ'ল। এখান থেকে পুরুলিয়া মাত্র ৪০ মাইল দূর।

যখন রওনা হ'লাম তখন বেলা তিনটা। বৃষ্টির দরুন্ রাস্তার পাশে একটা পোড়ো গোয়ালের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। পাশের গ্রামে নবমী পূজার ঢাক ঢোল বাজ্‌তে সুরু হ'ল। কতকগুলি ছেলে-মেয়ে আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও যান-বাহনের সরঞ্জাম দেখে আমাদের বিষয় গভীর আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিলে। ঘন্টাখানেক পর বৃষ্টি থাম্‌লে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। সুমুখে দূরে পরেশনাথ পাহাড়টি নীল আকাশের গায়ে আঁকা-বাঁকা-লাইন-টানা একখানা ছবির মতন দেখাতে লাগ্‌ল। বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে পরেশনাথ সব-চেয়ে উঁচু পাহাড় (৪৪৫০ ফিট) ও জৈনদের একটি মহাপীঠস্থান। দূরবীণ দিয়ে পাহাড়ের ওপরের জৈন মন্দিরটি বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। আমরা ক্রমেই পরেশনাথের কাছে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লাম।

রাস্তা বেজায় উঁচু নীচু ব'লে আমরা পরস্পর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে পড়তে লাগ্‌লাম। দেখ্‌তে ভারী মজা লাগছিল-কেমন ক'রে মাঝে-মাঝে একজন হেল্‌তে-দুল্‌তে অতি কষ্টে চড়াইয়ের উপর উঠ্‌ছে আবার সমুদ্রের জাহাজের মতন প্রথমে পিছনের চাকা, কম্বল, পরে পিঠ ও শেষে টুপি অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ঘনিয়ে এল। পরেশনাথ তার সমস্ত কবিত্ব মুছে অন্ধকারে বিরাট্ দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নীচে তোপচাঁচির বাংলোতে আমরা রাত কাটাবার ব্যবস্থা কর্‌লাম। একদল সাহেব মেম এখানে চড়ুইভাতি ক'রে পাত্‌তাড়ি গুটাবার বন্দোবস্ত কর্‌ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ জমে' উঠ্‌ল। তাদের মধ্যে একজন নিজের কাশ্মীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দেখবার মতো জায়গার খোঁজ দিলে ও সকলে আমাদের কৃতকার্য্যতা কামনা ক'রে বিদায় নিলে।

মিটারে ২০০ মাইল উঠেছে। সুতরাং আজ আমরা মাত্র ৪২ মাইল এসেছি।

২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবার - তোপচাঁচি বাংলোর এক মাইল দূর থেকে পরেশনাথ পাহাড় আরম্ভ হ'য়ে রাস্তার ডানদিক্ দিয়ে বরাবর সাত আট মাইল এসে ইস্ত্রি ষ্টেশনের কাছে শেষ হ'য়েছে। আজ তিন দিন পর আবার রেলের লাইনের সঙ্গে দেখা হ'ল। একটা ছোট নদী মহুয়া বনের ভেতর থেকে এসে একেবারে রাস্তার ওপর দিয়ে চলে গেছে। পাহাড়ী নদী - জল বেশী নেই, ছোট ছোট পাথরের ওপর দিয়ে জল যাওয়ার শুধু কুলকুল শব্দ। শরতের পরিষ্কার আকাশ, ভোরের মিঠে হাওয়া ও দূরের মহুয়া বনের নিস্তব্ধতায় চারদিকে বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব এনেছে। রাস্তা মন্দ নয়, তবে উঁচু নীচু। ছোটখাট পাহাড় জঙ্গল পিছনে ফেলে রেখে চলেছি।

আজ বিজয়া দশমী। বিহারীদের দশহরা; তারা দলে দলে পূজা ও মেলা দেখতে চলেছে। পথের দু'পাশে ঘন গাছের সারি। ক্রমশঃ যাত্রীর দল বাড়তে লাগল। শুন্‌লাম বাগোদরে মেলা বসেছে - উৎসববেশে সজ্জিত নরনারী দলে দলে বাগোদর অভিমুখে যাচ্ছে। এক এক করে তাদের সকলকে পিছনে রেখে আমরা বাগোদরে পৌঁছলাম। লোকে লোকারণ্য, রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দোকান ব'সে গেছে, চার পাশে মাঠে তামাসা দেখান হচ্ছে। আমরা মেলার কাছে মাঠে একটা বড় গাছের তলায় দুপুরের জলযোগের জন্য নেমে পড়লাম।

বাগোদর থেকে বাঁদিকের রাস্তায় হাজারিবাগ ও ডান দিকের রাস্তা দিয়ে গিরিডি যাওয়া যায়। ঐ দু'জায়গাতে যাওয়ার জন্য মোটর সার্ভিস আছে। লোকেরা প্রথমে দূর থেকে কৌতুহল-দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল। ক্রমে বোধ হয় তাদের সাহস বেড়ে গেল। একে একে পুরুষ ও পরে তাদের সঙ্গিনীরাও কাছে এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। এদের অধিকাংশের মুখ চোখ দেখে ঠিক খাঁটী বিহারী বা সাঁওতাল ব'লে মনে হয় না। তবে এরা সরল ও কর্ম্মঠ ব'লেই মনে হ'ল। এদের ভদ্রোচিত আচার ব্যবহার বেশ চোখে লাগে। গরুর গাড়ী থেকে এক বৃদ্ধ এসে মেলায় নাম্‌ল। কয়েকটি বালিকা ও তরুণী তাকে দেখে প্রত্যেকে মাথা

নত ক'রে দু'বার তার পায়ে হাত ঠেকিয়ে নিজেদের মাথায় ছোঁয়ালে ও পরে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম কর্‌লে। এদের শীলতা ও শিষ্টতা আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়।

আজ বিপরীত দিক্ থেকে হাওয়া বইছে; সুতরাং উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটু বেশ শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল। মেলা হ'তে দলে দলে লোক ফির্‌ছে। রাস্তায় বড় ভিড়। পুরুষরা গায়ে হল্‌দে চাদর ও হাতে লাঠি নিয়ে গম্ভীর ভাবে চলেছে। মেয়েরা রঙ-বেরঙের ছোপান কাপড় প'রে, মাথায় ফুল গুঁজে, মেলা থেকে পুঁথির মালা আর্‌সি চিরুণী কিনে হাসি মুখে বাড়ী ফির্‌ছে। ছোট ছেলেদের এক হাতে খাবার, আর এক হাতে তারা মায়ের কাপড় ধ'রে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা কর্‌ছে। বছরের পরবের দিন, সকলের মুখে চোখে যেন একটা হাসিখুসী ভাব লেগে রয়েছে।

সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় আমরা বর্হিতে পৌঁছলাম। এটি একটি বেশ বড় চটী। এখান থেকে রাস্তার ডান পাশে বজৌলী যাবার পথ ও বাঁদিকের পথ দিয়া হাজারিবাগ যাওয়ার যায়।

শ্রীযুত রাধিকানাথ গুঁইয়ের অনুগ্রহে থাক্‌বার জায়গা পাওয়া গেল। এখানেও পূজার ধুম কম নয়। প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখে ফির্‌তে অনেক রাত হ'য়ে গেল ব'লে দোকান বন্ধ - কোন খাবার যোগাড় কর্‌তে পারা গেল না। আজ মোট ৫৮ মাইল এসেছি। কল্‌কাতা থেকে ২০৮ মাইল আসা হ'ল।

২৮শে সেপ্টেম্বর সোমবার -
কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নাই ব'লে নিজেরা রাঁধবার ব্যবস্থা কর্‌লাম। বাজার থেকে চাল ডাল ইত্যাদি কিনে এনে খিঁচুড়ী রান্না হ'ল। এখানে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দালালের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটীতে তাঁর সহপাঠীদের নিকট আমাদের জন্য একখানি চিঠি লিখে দিলেন।

রওনা হ'লাম ১২॥০ টায়। রোদ ও খিঁচুড়ী খাওয়ার জন্য তেষ্টায় অস্থির। মাইল দশ দূরে চৌপারণ থানায় নেমে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম। চৌপারণের কিছু পর থেকেই হাজারিবাগের জঙ্গল সুরু হয়েছে। সাত আট মাইল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তাটি চ'লে গেছে। এই পথটুকু বেশীর ভাগই উৎরাই। কিন্তু রাস্তার অবস্থা বড় মন্দ ব'লে উৎরাইয়ে'র সুখটুকু উপভোগ করা গেল না। জঙ্গল খুব ঘন নয়। শাল পলাশ ও মহুয়া গাছই বেশী। জঙ্গলের সীমানায় একটা নদীর পুলের উপর এসে বস্‌লাম। খানিক দূরে এক সাহেব মোটর সারাচ্ছে। আমরা নদীতে জল খেতে যাবার আয়োজন কর্‌ছি এমন সময় সেই সাহেবের মেম ও তাদের মেয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ সুরু কর্‌লে। এঁরা কুল্‌টীতে থাকেন। মোটরে গয়া যাচ্ছেন। জঙ্গলে টায়ার ফেটে আট্‌কে পড়েছেন। সাহেব টায়ার মেরামত কর্‌লে তবে যাওয়া হবে। আমাদের সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ আলাপ হ'য়ে গেল। প্রত্যেক জিনিস পত্র দেখাতে হ'ল। সাইকেলের সাম্‌নে বোর্ডে লেখা প্রোগ্রাম দেখে তাঁরা খুব উৎসাহ প্রকাশ কর্‌লেন। ম্যাপ চেয়ে নিয়ে রাস্তা দেখলেন ও আমাদের অনেক লজেঞ্জুস্ ও সুইট্‌স্ দিলেন।

এখানে এসে জান্‌তে পার্‌লাম বাইনাকুলার গগ্‌লস্ ও রিং শুদ্ধ চাবি কোথায় পড়ে গেছে। বাইনাকুলার এর জন্য পরে বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল। মাইল তিন চার পর থেকে গয়া জেলা আরম্ভ হ'ল। এখান থেকে সমান ও সুন্দর রাস্তা সুরু হয়েছে। অনেক দিন পর সমতল রাস্তা পেয়ে আমরা মনের সুখে জোরে সাইকেল চালিয়ে বড়াচটীতে এসে পড়লাম।

সন্ধ্যার ঠিক আগে ফল্গু নদীর ধারে এলাম। নদীর ওপরে পাথরের নীচু পুল। বর্ষার সময় পুলের ওপর দিয়ে জল যায়। পুলে কোন রেলিঙ্ নেই, কেবল মাঝে মাঝে এক ফুট উঁচু থাম। দূরে নদীর দু'পাশেই নীল পাহাড়ের সারি -মনে হয় যেন ফল্গু এক দিকের পাহাড় থেকে বেরিয়ে আর এক দিকের পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। বালীর চড়ার ওপর দিয়ে জলের শুধু একটি ক্ষীণ ধারা বয়ে যাচ্ছে। আর একটা ছোট পুলের পর ডান দিকে গয়া যাবার রাস্তা ২০ মাইল।

সন্ধ্যার সময় সাইকেল আমাদের সেরঘাটীতে নামিয়ে দিলে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড থেকে ডান দিকে একটু নীচু জায়গায় সেরঘাটী সহর। এখান থেকেও গয়ায় যাবার রাস্তা আছে। এইখানেই খাবার জোগাড় করা হ'ল। খাওয়া দাওয়ার পর ঠিক হ'ল আজ সমস্ত রাত্রিই চলা হ'বে। সেইজন্য ঘন্টা দুয়েক বিশ্রাম নিতে আমরা একটা কুয়ার ধারে আস্তানা নিলাম। সেরঘাটী থেকে ডানদিকে গয়া ও বাঁদিকে ডাল্টনগঞ্জ যাবার রাস্তা আছে।

আমরা রওনা হ'ব এমন সময় থানা থেকে ডাক এল। মামুলি নাম ধাম দেওয়ার পর থানার দারোগা আমাদের রাত্রে চলার অভিপ্রায় শুনে পথের ধারে জঙ্গলে ভালুকের উপদ্রব আছে ব'লে নিরস্ত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। কিন্তু হাজারিবাগ জেলার উঁচু নীচু রাস্তার জন্য এ ক'দিন আমাদের চলা বড়ই কম হচ্ছিল। আজকের সুন্দর সমান রাস্তা ও চাঁদনী রাতের আলো পেয়ে এ-সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছা হ'ল না। সেইজন্য আমরা আর বাক্যব্যয় না ক'রে বেরিয়ে পড়লাম।

মাইল দু'য়েক পর থেকে রাস্তা মেরামত হচ্ছিল। সেইজন্য মাঝে মাঝে হেঁটে যেতে হ'ল। ক্রমশ" ভাল রাস্তায় এসে চলেছি। খুব জোরে ঘন্টা বাজিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পাশের গাছতলা থেকে এক বিকট চীৎকার শুনে আমরা হতভম্ব হ'য়ে ভাবলাম এ নিশ্চয়ই ভল্লুক! টর্চ্চ জ্বেলে দেখি আমাদেরই মত হতভম্ব একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা আর কিছু নয় বেচারা চৌকিদার, পাহারা দিতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল আমাদের চারজনের সাইকেলের ঘন্টা শুনে চম্‌কে চীৎকার ক'রে উঠেছে। ঘড়িতে দেখা গেল রাত ১টা। আর দেরী না ক'রে সাইকেলে উঠলাম।

ম্লান জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে দু'ধারে পাহাড় ও ঝোঁপ-ঝাঁপ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সুমুখ থেকে একটা গরুর গাড়ী ধীর মন্থর গতিতে আস্‌ছিল ব'লে জোরে ঘন্টা বাজাতে সুরু কর্‌লাম। আলো, টুপি ও ঘন্টার শব্দ শুনে গরু দু'টি কিছু মাত্র দ্বিরুক্তি না ক'রে রাস্তা ছেড়ে মাঠের ওপর দিয়ে ঘুমন্ত গাড়োয়ানকে নিয়ে ছুট দিল।

রাত ২॥ টার সময় আরাঙ্গাবাদে পৌঁছলাম। তখন চাঁদ ডুবে গেছে - অন্ধকারের জন্যে কি রকম সহর কিছু বুঝতে পার্‌লাম না। থানা ছাড়িয়ে চলেছি, এমন সময় পুলিশ পেট্রোলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। এদের হাতে রিভলভার, কোমরে তলোয়ার ঘোড়ায় চ'ড়ে ডিউটি ক'রে ফির্‌ছে। মিলিটারী কায়দায় চ্যালেঞ্জ ক'রে দাঁড়াতে বল্‌লে। নাম ধাম লিখিয়ে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অন্ধকারে এক গাছতলায় ব'সে সঙ্গে-আনা খাবার নিঃশেষ কর্‌তে লাগ্‌লাম।

মাইল কয়েক পর বাতানা নদীর নীচু পুলের ওপর গিয়ে পড়লাম। এই পুলটি ফল্গুর পুলের অনুরূপ। ওদিক্ থেকে এক সারি মাল বোঝাই গরুর গাড়ী আস্‌ছিল। সাইকেলের ঘন্টা শুনে ও আলো দেখে সাম্‌নের গাড়ীর গরু দুটি ঘুমন্ত গাড়োয়ান ও মাল ভর্ত্তি গাড়ী শুদ্ধ পুল থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়্‌ল। নদীতে বিশেষ জল ছিল না, আর নীচু পুল থেকে পড়ার জন্য বিশেষ কিছু ক্ষতি বোধ হয় হয়নি। এরা রাত্রে ঘুমিয়ে গাড়ী চালায় ব'লে কেবল তারা নিজেদের নয় অন্যান্য পথিকদেরও বিশেষ অসুবিধায় ফেলে। এ রকম ঘটনা আমরা পরে আরও দেখেছি।

রাস্তা বেশ সমতল ও সোজা। দূরে শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক ষ্টেশনের আলো হঠাৎ আকাশের গায়ে ফুটে উঠ্‌ল। আমাদের চোখও ঘুমে জড়িয়ে আস্‌ছে। মরুভূমির মরীচিকার মতন ষ্টেশন এই আসে আসে ব'লে নিস্তব্ধে গাড়ী চালাচ্ছি। ঘন্টাখানেক এইভাবে যাওয়ার পর শোন নদীর জলের শব্দ শুন্‌তে পেলাম। ক্রমেই জলের শব্দ বাড়তে লাগল; আমরাও নদীর কাছে এসে পড়েছি ব'লে সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে চল্‌তে সুরু কর্‌লাম। কিন্তু অনেক্ষণ হাঁটার পরও যখন নদীর দর্শন পাওয়া গেল না তখন আবার গাড়ীতে উঠলাম। নদীর ধারে এসে খবর নিয়ে জানা গেল এখানে পারের কোন বন্দোবস্ত নেই। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে কেবল শোনের ওপরই রেলের ছাড়া আর কোন পুল নেই। নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে মাইল খানেক সাইকেল চালিয়ে ঠিক ভোর ৪॥০ টার সময় ইষ্ট ব্যাঙ্ক ষ্টেশনে এসে উঠলাম। বর্হি থেকে আজ আমরা ৯১ মাইল এলাম। কল্‌কাতা থেকে মোট ৩৪৯ মাইল আসা হ'ল।

২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার - সকাল ৮টার গাড়ীতে শোন পার হওয়ার জন্য টিকিট ক'রে ফেল্‌লাম। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় টুরিষ্ট ব'লে সাইকেলগুলি না বুক কর্‌লেও চল্‌তে পারে বল্‌লেন। কিন্তু ওপারের বিহারী ষ্টেশন মাষ্টার কর্ত্তব্যের জন্য পুরাপুরী সেলামী আদায় ক'রে ছাড়লেন। শোনের পুল লম্বায় দেড় মাইলেরও বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যে বেশ একটা বড় পুল। এই সময়ে নদীতে খুব অল্প জল, সবই প্রায় চড়া, কিন্তু বর্ষার সময় বড় ভীষণ হ'য়ে ওঠে। পুলের ওপর বাঁ দিকে সরু ফুটপাথ দিয়ে এপার থেকে ডিহীরি যাওয়া যায়। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের শেষে নদীর ওপর বরাবর ওপার পর্য্যন্ত বাঁধ আর মাঝে-মাঝে ফাঁক

আছে। জল কম থাক্‌লে বাঁধের ওপর দিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। বর্ষার সময় বা নদীতে জলে বেশী থাক্‌লে রেলের পুল ভিন্ন অন্য কোন গতি নেই।

বেলা প্রায় ৯টার সময় ডিহীরিতে শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপ্যাধায়ের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করা গেল। বেলা প্রায় ৫টার সময় আবার বেরিয়ে পড়লাম।

বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা ব'লে ডিহীরির প্রতিপত্তি আছে। সহরের মধ্যে কিন্তু আবর্জ্জনা ও ধূলার অভাব নেই। নদীর ধারটাই যা একটু ভাল ব'লে মনে হয়। ওপারের পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে, শাল পলাশ মহুয়ার বনও মিলিয়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশে যতদূর দেখা যায় কেবল ধূধূ মাঠ।

সন্ধ্যার সময় সসারামে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে ডান দিকে আরা যাবার রাস্তা। পথে ডুমরাও ও বক্সার যাওয়া যায়। এখানকার লোক সংখ্যায় বেশীর ভাগই মুসলমান। সহরটির পুরান ধরণের বাড়ী ও রাস্তাঘাট দেখলে মুসলমান আমলের সহর বলে চোখে ঠেকে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর এ-রকম ধরণের সহর এই প্রথম। রাস্তার বাঁধারে জ্যোৎস্নার আলোতে দূরে শের সার সমাধি দেখা গেল। আজও সমস্ত রাত বাইক কর্‌ব মনে কর্‌ছি। চারদিক নিস্তব্ধ। যেখানে দু'পাশের গাছের ছায়ায় রাস্তা একেবারে অন্ধকার সেখানে আমাদের ল্যাম্পের আলো অন্ধকার দূর ক'রে যাবার যেমনি পথ কর্‌ছিল, ফাঁকা রাস্তার চাঁদের আলোতে নিজের অস্তিত্ব মিলিয়ে ঠিক তেমনি সুবিধার কারণ হচ্ছিল। প্রায় ১০৷৷টার সময় রাস্তার পাশে খালের ধারে একটি সুন্দর জায়গায় আমরা সে রাতের খাওয়া শেষ কর্‌লাম।

দূরে বোধ হয় রেলওয়ে ষ্টেশনের আলো দেখা গেল। সমস্ত রাত বাইক করার সঙ্কল্প কোথায় ভেসে গেল। বাকী রাতটুকু ঐখানেই কাটাব স্থির করা হ'ল। রাত ১১৷৷০ টার পর কুদরা ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। অ্যাসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় বাঙালী। আমাদের পরিচয় পেয়ে ওয়েটীং রূমে থাক্‌বার ও আলো জল ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ডিহীরি থেকে আজ মোট ২৮ মাইল আসা হ'ল। কলকাতা থেকে মোট ৩৭৭ মাইল এসেছি।

- ক্রমশঃ -

(প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৩ সংখ্যা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল আর্কাইভ

[মূলের বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

☆☆☆☆☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বিদায়বেলায় বাঁকুড়ায়

তপন পাল

প্রথম দিন

ইংরেজ আমলে রাজকর্মচারীদের মধ্যে ফেয়ারওয়েল ট্রিপ বলে একটি কথা খুব চালু ছিল। অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কোনও সরকারি কর্মচারী বদলি অথবা অবসর গ্রহণের আগে, তার এলাকাভুক্ত সকল অধস্তন অফিসগুলি ঘুরে দেখতেন, যথা জেলাশাসক যেতেন মহকুমা অফিসগুলিতে। স্বাধীনতার পরেও দশক চার-পাঁচেক প্রথাটি বহাল ছিল। এবং এই উপলক্ষে খাওয়াদাওয়া, উপহার প্রদান, অশ্রুপাত ইত্যাদি প্রভৃতি।

তাই জানুয়ারি মাসের শুরুতে অফিস থেকে আমার যখন বাঁকুড়া যাওয়ার হুকুম হল, আমি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী না হয়েও নিজেকে উচ্চপদস্থ ভাবতে শুরু করলাম। আমার জন্ম ১৯৫৯-এর জানুয়ারিতে। ২০১৯ এর জানুয়ারিতে ষাট পূর্ণ হয়ে ৩১শে জানুয়ারি অপরাহ্ণে চাকরিজীবন থেকে মিলিয়ে যাওয়ার কথা। তার আগে এই!!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় সেতু, বর্ধমান। তারপর দামোদর পেরিয়ে, বর্ধমান বাঁকুড়া রোড ধরে দামোদরের শাখানদী বোদাই-এর দক্ষিণতীরে হদলনারায়ণপুর গ্রামে। হদলনারায়ণপুর গ্রামের মন্ডল উপাধিধারী জমিদার পরিবারের আদিপুরুষ মুচিরাম ঘোষ মল্লরাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে (১৭২০-১৭৫২) নীলপুর থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। তারপর গোপাল সিংহের সভাসদ গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর দাসের সঙ্গে আলাপ হয়ে মুচিরামের কপাল খুলল - প্রথমে হদলনারায়ণপুরের প্রশাসক পদ লাভ, তৎপরে মন্ডলপতি উপাধি। ক্রমে জমিদারি বিস্তার, অট্টালিকা ও মন্দির স্থাপন। বালজাকের বিখ্যাত উক্তি - Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu' il a été proprement fait (Behind every great fortune, there is a crime which has not been found) মেনে পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল নীল চাষ।

গ্রামে ঢোকার মুখেই ব্রহ্মাণী দেবীর দালান মন্দির; কষ্ঠিপাথরের মূর্তিটি উচ্চতায় ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ২ ফিট ১১ ইঞ্চি। মূর্তিটির পায়ে, দুই পাশে এবং পিছনের খিলানে সবশুদ্ধ পাঁচটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের অনুকৃতি থেকে পণ্ডিতদের ধারণা ইনি 'পঞ্চকুণ্ডাঅগ্নিমধ্যস্থা' পার্বতী। কখনও কোন এক "মুড়োকাটা" চক্রবর্তী এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বালবিধবা মেয়ে স্বপ্নাদেশ পেয়ে দামোদরের দহ থেকে এই মূর্তি উদ্ধার করেন। মতান্তরে রানি ময়রা নামের এক তাম্বুলি মহিলা স্বপ্নাদেশ পেয়ে দামোদরের পাশে গভীর কাদার ভিতর থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন। দামোদরে মূর্তির ছড়াছড়ি চিরদিনই; বর্ধমানের কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী কালীবাড়ির তিন ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট লম্বা অখণ্ড পাথরে খোদিত অপ্রথানুগ অষ্টভূজা বিগ্রহটিও দামোদরে পাওয়া গিয়েছিল ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে।

হদলনারায়ণপুরের অপরাপর দ্রষ্টব্য মন্ডল পরিবারের বসতবাড়ি, রাসমঞ্চ এবং তাঁদের নির্মিত তিনটি টেরাকোটা মন্দির (বড় তরফ, মেজ তরফ ও ছোট তরফ)। মন্ডল পরিবারের বড় তরফের প্রাসাদোপম দোতলা অট্টালিকাটি মহামহিম। পশ্চিমবাংলার গ্রামে এহেন সাতমহলা বসতবাড়ি বিরল। বসতবাটির প্রাঙ্গণে সতেরো চূড়াবিশিষ্ট,আটকোণা,দ্বিতল রাসমঞ্চ; উচ্চতা ৪০ ফুট এবং ভিত্তি বরাবর প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। দেওয়ালগাত্রে অনন্তশয়নে বিষ্ণু,পুত্রকন্যাসহ মহিষমর্দিনী, শিববিবাহ,কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা,গজলক্ষী,রামসীতা এবং কৃষ্ণরাধিকা। বসতবাটির ভিতরের উঠানে ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত রাধাদামোদরের ত্রিখিলান দালানসহ দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দির।

গ্রামের উত্তর দিকে মেজ তরফের পূর্বমুখী রাধাদামোদরের নবরত্ন মন্দির; তার পূর্বে ও উত্তরে ত্রিখিলান দালান। মন্দিরের দেওয়ালের টেরাকোটা অনুপম, পূর্ব দিকের খিলানে লঙ্কা যুদ্ধ,অনন্তশায়ী বিষ্ণু,কৃষ্ণের চূড়াবাঁধা ও ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ|

ছোটতরফের আবাসগৃহের প্রাঙ্গণে দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটির আদল গির্জার মত; সামনে ত্রিখিলান দালান, পশ্চিমে দেওয়াল ঘেঁষে সিঁড়ি। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দেওয়ালে সূক্ষ্ম টেরাকোটা অলংকরণ। কেন্দ্রীয় খিলানের শীর্ষে অর্জুনের মৎসচক্ষু লক্ষ্যভেদের বড় প্যানেল। শ'দুয়েক বছর আগে বাবুরাম মন্ডল তার নাবালক পুত্র গঙ্গাগোবিন্দের নামে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

তারপর সোনামুখী হয়ে বিষ্ণুপুর; তাকে পাশ কাটিয়ে পাঁচমুড়া। বাঁকুড়ার ঘোড়া (এবং হাতি,ষাঁড়,দুগ্গাঠাকুর...) বলে অধুনাখ্যাত গৃহসজ্জার উপকরণটি নির্মাণের শিল্পকেন্দ্রগুলি হল পাঁচমুড়া, রাজাগ্রাম, সোনামুখী ও হামিরপুর। প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রের নিজস্ব ধাঁচ ও শৈলী রয়েছে,তবে সবাইকে ছাপিয়ে পাঁচমুড়াই এখন অতিখ্যাত। এখানকার শৈলীই সার্বজনীন মান্যতা পেয়েছে। মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার পর প্রতীকী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লৌকিক পন্থা অশ্বত্থ বেদিমূলে অথবা ধর্মরাজের থানে পোড়ামাটির ঘোড়া প্রদান। গ্রামীণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য সৃষ্টি হয়ে রূপারোপিত পোড়ামাটির ঘোড়া আজ বিশ্বখ্যাত। এর অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা; বিভিন্ন অংশ পৃথক পৃথকভাবে কুমোরের চাকায় নির্মিত হওয়ার পর সেগুলিকে জোড়া দেওয়া হয়। কাঁচামাটি দিয়ে তৈরি পাতার মতো আকৃতিবিশিষ্ট কান ও লেজ ঘোড়ার দেহের তিনটি গর্তে প্রতিস্থাপিত হয়।

পাঁচমুড়া যাওয়ার পথে ধর্মরাজার থানে পোড়ামাটির ঘোড়ারা

গ্রামের প্রতিটি ঘরেই এই কাজ হয়,তালড্যাংরা থানার এই গ্রামে টেরাকোটা শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন কুম্ভকার সম্প্রদায়ের প্রায় তিনশো শিল্পী। প্রতিটি বাড়িই একটি করে স্টল। সেখানেই ঘরের ভিতর,বারান্দায় পসরা সাজানো। পাশেই পসরা বানাচ্ছেন শিল্পীরা। শিল্পবস্তুর পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে প্রাত্যহিক কাজে ব্যবহৃত রান্নার হাঁড়ি, খোলা, ভাঁড়, জলের কলসি, জালা,সরা...। শিল্পবস্তুতে ব্যবহৃত রঙ বাজারের কোনও রাসায়নিক রঙ নয়,জমি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ঘরের মেয়েদের দ্বারা সংগৃহীত। মাটির সামগ্রী পুড়ে কালো বা লাল হওয়া পুরোটাই কৌশলের উপর নির্ভর করে। লাল রঙ করার জন্যে ভাটির ভিতর উৎপন্ন ধোঁয়াকে বের করে দেওয়া হয় ভাটির গায়ের বিভিন্ন গর্তের মাধ্যমে। এবং কালো রঙ করার জন্যে গর্তগুলিকে বন্ধ করে উৎপন্ন ধোঁয়াকে বাইরে বেরতে দেওয়া হয় না।

পাঁচমুড়া গ্রামে 'বাঁকুড়ার ঘোড়া' রা ক্রেতার অপেক্ষায়

তালড্যাংরা থেকে বাঁকুড়া। শহরে ঢোকার আগে এক্তেশ্বর শিব মন্দিরে। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে এই মন্দিরে শিবের রুদ্রমূর্তির একটি অদ্ভুত উদ্ভাস একপদ রূপ পূজিত হয়। বিগ্রহের এক পা কিন্তু দুই হাত। এই ধরনের শিবমূর্তি অন্য কোনও শিবমন্দিরে নেই। বিষ্ণুপুরের রাজা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন ল্যাটেরাইটে, পরবর্তীকালে বেলেপাথর ও ইটের কাজ যুক্ত হয়েছে। মন্দিরটির কাঠামো অত্যন্ত দৃঢ়,যা বাংলার অন্যান্য মন্দিরে সাধারণত দেখা যায় না। মন্দিরটি বাংলার নিজস্ব শৈলীরও নয়।

এক্তেশ্বর শিব মন্দির প্রাঙ্গণে

কিংবদন্তি অনুসারে, বিষ্ণুপুর ও সামন্তভূম রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত-সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করার জন্য স্বয়ং শিব দুই রাজ্যের সীমানাতে স্থিত হয়ে তাদের মধ্যে একতা তৈরি করেন;তাই তিনি একতার ঈশ্বর এক্তেশ্বর। এরকমটি স্বচ্ছন্দে ভেবে নেওয়া যেতে পারে যে সীমানা নির্দেশক স্মারকরূপেই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। নবম শতকে মন্দির নির্মাণ করা হতো ত্রিরথ আসনে। মন্দির দেওয়ালের পাদদেশ অধিকার করেছিল তিনটি মোল্ডিং-এর বেদিবন্ধ। মোল্ডিংগুলির একটি ছিল বর্তুলাকার। এই মন্দিরটিই এই শৈলীর একতম নিদর্শন। বেদিবন্ধের উপর থেকে মন্দিরের আদিরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। এক্তেশ্বরের গর্ভগৃহে কূপসদৃশ গভীর মেঝে বাংলার প্রস্তর মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একক উদাহরণ,যদিও প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যে এরকম অনেক নিদর্শন রয়েছে। তবে পুরোহিত আপনাকে বোঝাবেন যে এই মন্দিরটি দ্বাপরযুগে পান্ডবদের নির্দেশে স্বর্গের স্থপতি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত; বা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এখানে ধ্যান করে সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করেছিলেন। গবেষকদের একাংশের মতে এটি জৈন মন্দির; কালক্রমে হিন্দু মন্দির হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। সংলগ্ন অঞ্চলটির নামও এক্তেশ্বর। আগে বর্ষায় দ্বারকেশ্বর মন্দির ভাসাত। সম্প্রতি রাজ্য সেচ দফতর দ্বারকেশ্বরের পাড় বাঁধিয়ে মন্দিরটিকে রক্ষা করেছেন। সারা শ্রাবণমাস ভক্তরা শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝরনার জল নিয়ে এসে এখানে শিবের মাথায় ঢালেন। প্রতিবার বাংলা বছরের শেষের তিনদিন এখানে গাজন বসে। প্রথম দিন পাটস্নান, দ্বিতীয় দিন রাতগাজন ও তৃতীয় দিন দিনগাজন। গাজনের মেলা ছাড়া শিবরাত্রি ও পৌষ সংক্রান্তিতে আরও দুটো মেলা হয় এক্তেশ্বরে।

অফিসের কাজকম্ম কিছুটা সেরে সন্ধ্যায় রানীগঞ্জ-মেজিয়া-বাঁকুড়া রাজপথ ধরে বাঁকুড়া শহরে ঢোকার ঠিক আগেই বাঁ দিকে বিকনা, দেড়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে ডোকরা গ্রাম বলে পরিচিত। গ্রামের গোটা চল্লিশেক ঘরের বাসিন্দারা সকলেই পুরুষানুক্রমে ডোকরা শিল্পী। ঢুকেই মনসা দেবীর থান এবং বিভিন্ন ভোটিভ মূর্তি; তখনও শিল্পীরা কাজ করছেন। অতিশয় জটিল এবং অনেকগুলি ধাপের মধ্যে দিয়ে চলেছে পিতল ঢালাইয়ের কাজ।

বিকনার ঘরের দাওয়ায় ডোকরা শিল্পসামগ্রী

ডোকরাতে পিতল গলানোর কাজটি আগে করা হত কয়লার ভাটিতে। পরিবেশ দূষণ কমাতে ও শিল্পীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এখন এসেছে ইলেকট্রিক বা গ্যাস ওভেন। প্রথমে মোমের ওপর নকশা তোলা হয়, এর পর দেওয়া হয় বালি আর মাটির আস্তরন। দু ধরনের স্তর থাকে, প্রথমে লোনা মাটি, দ্বিতীয় স্তরে লোটা মাটি। তারপর পিতল গলিয়ে সেটি একটি ছিদ্র দিয়ে ঢেলে দেওয়া হয় মাটির ছাঁচে। ঠান্ডা হলে মাটির ছাঁচটিকে ভেঙ্গে বার করা হয় শিল্পবস্তুটিকে। বাজারের সঙ্গে তাল রেখে, জনরুচির সঙ্গে কিঞ্চিৎ আপোষে, শিল্পে অধুনা কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের হাওয়া। অনেক লোকশিল্পের মতই ডোকরার মধ্যে একটা rustic character ছিল। পরিশীলিত রুচির বাবুমশাইদের কাছে বিক্রি করার দায়ে বাংলার ডোকরার কাজে কোণাচে ভাব এখন কমার মুখে,তার জায়গা নিচ্ছে উড়িষ্যার মতন সুতোর কাজ, বস্তারের মত পালিশ। ঠিক যেমন খোলা আকাশের নিচে ধর্মরাজের থানে পড়ে থাকা গ্রাম্য,অসভ্য,গেঁয়ো,সরল সাদাসিধা অকর্ষিত অসংস্কৃত পাঁচমুড়ার ঘোড়া শহুরে মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাটের কোণে ঠাঁই পাওয়ার তাগিদে আজ পালিশ খায়, গহনা পরে।

দ্বিতীয় দিন

বাঁকুড়ায় অবস্থিতি কলেজ মোড়ে রাস্তার ওপরেই বালিকা বিদ্যালয়ের বিপরীতের বাংলোতে। সকালবেলা বাংলোটাকে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। বিগত আটতিরিশ বছর কাজে অকাজে, দরকারে অদরকারে, পশ্চিমবঙ্গের সদর মফস্বলে ছড়িয়ে থাকা সরকারের বিভিন্ন দফতরের ডাকবাংলো, পরিদর্শন বাংলো, গেস্ট হাউস, সার্কিট হাউসে রাত্রিবাস করেছি। শুরু হয়েছিল মালদা শহরের মকদুমপুরের বারলো গার্লস স্কুলের বিপরীতের ডাকবাংলো দিয়ে, যৌবনের উপবন মালদা পঞ্চানন্দপুরের সেই গঙ্গা ভবন আজ নিহিত পাতালছায়ায়। আর শেষ হল এখানে। আগামীমাস থেকে আর কেউ আমার জন্যে কোনও বাংলোর গেট খুলে দাঁড়াবে না। সে হোকগে! এককালে বেড়াতে গিয়ে সরকারি থাকার জায়গা না হলে চলতো না, কারন বেসরকারি ব্যবস্থা বলতে তেমন কিছু ছিল না। এখন চিত্রটি অনেকখানিই বদলেছে।

অনেক রাত অবধি বাংলোয় কাজ করেছি, সকালেও আবার তাই নিয়ে বসা গেল। দশটায় অফিস। কাজ কিছুটা সেরে বেরনো হল। প্রথম গন্তব্য ঝিলিমিলি। সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা, আঁধারে মলিন হল।

ঝিলিমিলি যাওয়ার পথের দুধারে অরণ্যানী, তার মধ্য দিয়ে কংসাবতী প্রবাহিতা। ওয়াচ টাওয়ার থেকে দৃষ্টি অবাধ চরাচরে তীব্র নির্জনতা। কূজন, কাঠবিড়ালি, মধ্যে মধ্যে বনমুরগির আশ্লেষ, শালের জঙ্গল, লাল মাটির রাস্তা, আর আদিগন্ত সবুজ। টুসু পরব এইসময়েই। এখান থেকে তালবেরিয়া ড্যাম আট কিলোমিটার। আরণ্যক টিলায় ঘেরা অনেকখানি স্বচ্ছ টলটলে জল। তারপর সুতানের জঙ্গল-শাল, পিয়াল মহুয়া কেন্দ শিরিষ, সেগুন শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া খিরিশ আকাশমণি। তার মধ্যেই 'বারো মাইল ভিউ পয়েন্ট'; রাস্তার ধারে দুটি ওয়াচ টাওয়ার। এলিফ্যান্ট করিডর, জঙ্গলে ঢাকা বিস্তৃত উপত্যকা, দূরবর্তী গ্রাম, কাঁসাই মুকুটমণিপুর মাখামাখি সে এক জমজমাট ব্যাপার। এই জঙ্গলে তেমন জন্তু জানোয়ার নেই।

সেখান থেকে মুকুটমণিপুর। শীতের ছোট বেলা ততক্ষণে পড়ে এসেছে। গাড়ির সামনে কিছু কাগজপত্র লাগানো ছিল; তাই বাঁধের পাড় বরাবর গাড়ি নিয়ে চলার অনুমতি পাওয়া গেল। কংসাবতী আর কুমারী নদীর সঙ্গমে বাঁধ, জলের ছলছল। আকাশ অস্তাভায় রঙিন, অনেকদূর দিয়ে একটু আগে ক্যাথে-প্যাসিফিকের মালবাহী বিমান উড়ে গেছে মুম্বই থেকে হংকং, আটতিরিশ হাজার ফুট দিয়ে; রেখে গেছে ধোঁয়ার দুটি রেখা। রাস্তার একদিকে কংসাবতীর ব্যাপ্ত জল আর অন্যদিকে পাহাড় আর ছোট ছোট গ্রাম। পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা দল বেঁধে এসেছে, পাঁইপাঁই করে সাইকেল চালাচ্ছে। চারিদিকে পাখির ডাক। শুধু ঝালমুড়িওয়ালা ফুচকাওয়ালারই অভাব। চাইলে নৌকো করে এখানে ড্যামের মধ্যে ঘোরা যায়; কংসাবতী ও কুমারী নদীর মোহনা থেকে নৌকো চড়ে নদীর ওপারে যাওয়া যায় আর সেখান থেকে ডিয়ার পার্কে যাওয়া যায়। তবে আমার সেই সময় বা সাহস হয়নি।

মুকুটমণিপুরে সূর্যাস্ত

টিলার ঢালে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্টের সোনাঝুরি টুরিস্টলজটি সরকারি, আর টিলাশীর্ষের বনবাংলোর পথ -প্যাঁচানো চড়াই। বাঁধ ধরে ছয় কিলোমিটার গেলে পরেশনাথ টিলায় পার্শ্বনাথ স্বামীর মন্দির। নদী পেরিয়ে আরও দেড় কিলোমিটার গেলে সবুজদ্বীপ। আরও চার কিলোমিটার গেলে গোরাবাড়ি পেরিয়ে অম্বিকানগর - অতীতের কীর্তিখ্যাত রাজা অনন্তধবল দেও-এর অম্বিকা মন্দির। এক সময়ে এই স্থান ছিল জৈন ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান। ইতিউতি খুঁজলে পাওয়া যায় ভাঙা মূর্তির অংশও। কিছুটা এগিয়ে ব্যারেজ; সেচের কাজে জল ছাড়া হয়। আপাতত লকগেট বন্ধ।

বাংলোর ডাল-ভাত এই শীতে পছন্দ হচ্ছিল না। তাই অনেক রাতে খেতে যাওয়া হল দ্বারকেশ্বর পেরিয়ে ধলডাঙ্গা বলে একজায়গায়, ধাবাতে।

যাওয়ার পথে ভৈরবস্থানে; কাল শিব দেখেছি, এবার কালী না দেখলে হয় নাকি! মাকে পাত্তা না দিলে বাবা নাকি খুব অসন্তুষ্ট হন, দেওঘরের পান্ডা অনেক বছর আগে এমনটি বলেছিলেন। তাই শহরের ভৈরবস্থানে -যেখানে মহাকাল ভৈরব ও মহাকালীর অবস্থান পাশাপাশি। আশি বছর আগে এই ভৈরবস্থানকে দেবস্থান হিসাবে আবিষ্কার করেন জনৈক জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়; মন্দিরটি পারিবারিক হলেও প্রবেশাধিকার অবাধ। তবে মন্দিরটির সর্বাঙ্গে যেন মেঠো বন্যতার ছাপ। তাই দেখে পণ্ডিতদের ধারণা দক্ষিণ রাঢ়বঙ্গে আর্যীকরণের আগে থেকেই দেবস্থানটি ছিল। পরবর্তীকালে দক্ষিণ রাঢ়বাংলার আর্যীকরণকালে আদিবাসীরা ক্রমশ দক্ষিণে চলে যাওয়ায় ধর্মস্থানটিতে আর্য প্রভাব পড়ে; বটবৃক্ষের নিচে ঠাঁই পায় মহাকাল ভৈরব। তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে স্থাপন করা হয় মহাকালীকে।

ধলডাঙ্গারধাবার সামনে তখন সারি সারি কলকাতাগামী বাস দাঁড়িয়ে। পেট পুরে খেয়েদেয়ে কনকনে শীতে অনেক রাতে বাংলোয়।

তৃতীয় দিন

ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার ছাতনার অধিবাসী ছিলেন। মৌখিক ইতিহাস বলে গৌড়ের নবাবের বেগম (মতান্তরে কন্যা) রাজসভায় চণ্ডীদাসের ভক্তি-প্রেমের গান শুনে মুগ্ধ হন, চণ্ডীদাসের গুণের অনুরাগিণী হয়ে পড়েন। ঈর্ষাকাতর নবাব চণ্ডীদাসকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। হস্তিপৃষ্ঠে আবদ্ধ চণ্ডীদাস কশাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন, বেগম সেই দৃশ্য দেখে শোকে মুর্চ্ছিতা হয়ে প্রাণবিয়োগ করেন। ছাতনায় বাসলি দেবীর দুটি মন্দির। পুরাতন মন্দিরটির ভিত্তিবেদি অতি উঁচু, পাথরের চৌকাঠগুলির গায়ে পদ্মের বড় বড় নকশা। প্রতিতুলনায় ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন মন্দিরটি নবীন, ঝকঝকে। লোক বিশ্বাসে বড়ু চণ্ডীদাস পূজিত বাসলি দেবীর মূর্তিটি তাঁর ভিটের আদি মন্দির থেকে প্রথমে বর্তমানে ভেঙে পড়া মন্দিরটিতে এনে রাখা হয়েছিল। পরে এই মন্দিরটি ভেঙে পড়লে সেটিকে পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে স্থানান্তরিত করা হয়।

চণ্ডীদাসপূজিত বাসলি দেবীর মন্দির - ছাতনা

ছাতনা চন্ডীদাস বিদ্যাপীঠের পিছনে গোলাকৃতি মজবুত ইটের সিমাফোর টাওয়ার। ১৮২০ সালে তদানীন্তন ভারত সরকার বার্তাপ্রেরণের মাধ্যম হিসেবে কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত প্রতি ৮ মাইল অন্তর ১০০ ফুট উঁচু এই টাওয়ারগুলি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি রূপায়িত হবার আগেই উন্নত পদ্ধতিতে টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হলে মাঝখানেই এই প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়।

ছাতনা রেল স্টেশন থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে শুশুনিয়া পাহাড়, আর তাকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র বিহারীনাথ; বাঁকুড়া জেলার উচ্চতম পাহাড় (১৪৮০ ফুট), এবং বনাঞ্চল। কিছু প্যালিওলিথিক প্রত্নসামগ্রী উদ্ধার হওয়ার পর থেকে এই পাহাড় ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি নিয়ে পুরাতাত্ত্বিকরা আগ্রহী হন। একটি ছোট জলাধারকে আর একটি প্রাচীন জৈনমন্দির নিয়ে বিহারীনাথ। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম শিলালিপিটি এই পাহাড়েই অবস্থিত। নৈঃশব্দ ঘিরে আছে পাহাড়ে।

শুশুনিয়াতে

সেখান থেকে শাল, সেগুন, মহুয়াঘেরা আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি। খান বিশেক পরিবারের গ্রামটির প্রতিটি বাড়ি যেন রং-তুলির ক্যানভাস। তার পাশেই ছোট ছোট টিলার মাঝে নীল আকাশের নীচে এক সুবিশাল হ্রদ মুরারডি। গ্রামের একদিকে পঞ্চকোট পাহাড় আর অন্যদিকে বিহারীনাথ পাহাড়। মুরাডি এবং বড়ন্তি পাহাড়ের মাঝে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সেচ বাঁধ। আর বাঁশ, শাল, পিয়াল, আমলকী, বহরা, হরিতকী, নিম; সারি সারি খেজুর গাছ। এছাড়া সর্বব্যাপী পলাশবন। বসন্ত হেথায় বড়ই মনোরম। প্রচুর পাখি আর প্রজাপতির আনাগোনা এখানে। বসন্ত আসছে বোঝা গেলো এখানে এসে। এখানকার বেল কার্ভ সদৃশ পাহাড়টি অতিখ্যাত।

বড়ন্তি থেকে সাঁতুরি শালতোড়া মেজিয়া হয়ে, দামোদর পেরিয়ে, রানীগঞ্জ। তারপর কলকাতা।

বড়ন্তি

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূলক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সে বিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালকে বাংলা লিখতে শিখিয়েছে 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না'।

পুরুলিয়ার পথে পথে

মলয় সরকার

~ পুরুলিয়ার আরও ছবি ~

হঠাৎই, ওই উঠলো বাই তো কটক যাই, না কটক নয়, ঝোঁক হল পুরুলিয়ার লাল মাটির বুকের ধুলো গায়ে মাখার। চড়ে বসলাম হাওড়া-রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে। তার আগে ঝটপট করে নেটের সাহায্যে ঘর বুক করে ফেলেছিলাম পুরুলিয়াতে ট্যুরিজম সংস্থার হোটেলে।

১৯/১২/১৮
ট্রেন বেশ ফাঁকা। ঝাড়গ্রাম ছাড়াতেই শালশিশুদের সঙ্গে দেখা। তারা ছোট ছোট কচি কচি সবুজ শরীর আর মাথা দুলিয়ে তাদের দেশে অভ্যর্থনা করতে লাগল। এই ঝাড়গ্রাম ছাড়ালেই বরাবরই আমার একটা অদ্ভুত ভাললাগা কাজ করতে থাকে। সেটা এই রাস্তার গাছপালা, মাঠ, পুকুর, পথচলতি মানুষজন বা ছোট তিরতিরে আধাশুকনো অখ্যাত নদী, যাই হোক না কেন। একঘণ্টা দেরিতে এসে পৌঁছালাম বরাভূম স্টেশনে। তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। বাইরে বেশ একটা ঘোরলাগা অন্ধকার। তারমধ্যে বৈদ্যুতিক আলোগুলোকে যেন মিটমিটে মাটির প্রদীপের মত লাগছিল। গাড়ি অপেক্ষা করছিল। পৌঁছালাম বেশ কিছুটা দূরে, অযোধ্যা গেস্ট হাউসে। গাড়ি যখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে, বেশ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, পাহাড় দেখা যাচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, একটা গা ছমছমে পরিবেশের মত,বেশ উপভোগ করছিলাম। ড্রাইভার দেখাচ্ছিলেন, ওই দেখুন, দূরে যে আলো জ্বলছে সার দিয়ে একটু উঁচুতে ওটা আপার ড্যাম। আর ওর নীচে দেখুন লোয়ার ড্যাম। কাল দিনেরবেলা তো যাবেন, দেখবেন কী সুন্দর!

হোটেল - অযোধ্যা গেস্টহাউস,একেবারে নতুন,অযোধ্যা পাহাড়ের কাছেই বাঘমুণ্ডি গ্রামে, একেবারে গ্রামের পরিবেশের মধ্যেই। জায়গাটির স্থানীয় নাম ছাতাটাঁড়। এখানকার ছাতাপরবের জন্যই এই নাম। ভাদ্রমাসের শেষদিকে,বিশ্বকর্মা পূজার দিন এই পরব হয়। স্থানীয় রাজা ছাতা তুলতেন বা এখনও সেই বংশের কেউ না কেউ তোলেন। তারপর একটা গাছের ডাল বাড়ির সামনে ক্ষেতে বা মাটিতে পোঁতা হয় যাতে পেঁচা বা অন্য পাখি তাতে বসতে পারে। এটা গ্রামীণস্থানীয় কৃষিভিত্তিক পরব বুঝতে পারি।

হোটেল কর্তৃপক্ষের এখনও পাকাপাকি পুরো পেশাদারিত্ব আসেনি। হোটেলটাতে সবকিছু যে একেবারে অন্য ব্যস্ত হোটেলের মত আছে তা নয়। তবে ছেলেগুলি স্থানীয় এবং বেশ ভদ্র বিনয়ী। রাতের খাওয়ার রুটি-মাংস ও কপির তরকারি ঘরেই দিয়ে গেল। রান্নাও বেশ ভাল,ঘরের রান্নার মতই। ছেলে বা মেয়েগুলি অপেশাদারিত্বের সরলতা নিয়ে আন্তরিকভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে আপ্যায়ন করছে। এটার প্রতিও একটা ভাললাগা কাজ করছিল। পেশাদার হোটেলে তো অনেক থেকেছি। তাই এই অপেশাদারি ভাব একটু অন্যরকমের স্বাদ এনে দিল।

২০/১২/১৮
সকালে বেড টি দিয়ে গেল। খেয়ে স্নান করে বারান্দায় মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। গ্রামের জীবন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। চারপাশে শাল সেগুন পলাশ কালকাসুন্দে খেজুর গাছের ভিড়। একটা নাম না জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে হালকা একটা পাখির ডাকের সঙ্গে।

গ্রামের বাড়ি - অযোধ্যা পাহাড়ে

সসকালের ব্রেকফাস্ট সেরে বাইরে এসে দেখি একেবারে নতুন একটা সুইফট ডিজায়ার দাঁড়িয়ে আছে দরজায়,গাড়ির এখনও নম্বর পড়েনি। ড্রাইভার,আর একটি কমবয়সী ছেলে -'ছোটে'র সঙ্গে বেরোলাম। ভাল ছেলেটি আর বেশ হাসিমুখও। প্রথমে গেলাম লোহারিয়া শিব মন্দির। মন্দির বেশি বড় নয় তবে চৌহদ্দিটা বড়। তার মধ্যে আছে রামের মন্দির,রাধাকৃষ্ণের মন্দির ইত্যাদি। এলাকায় অনেক ছোট ছোট পূজা বা খেলনা সামগ্রীর দোকান। তবে জায়গাটা বেশ ঝাড়ু দেওয়া এবং পরিচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এক নতুন তথ্য। এখানে মন্দিরের বেশ কিছু ঘর আছে যেখানে নানা ধরনের ভক্তেরা শিবের কাছে মানত করে পড়ে থাকেন বহুদিন। এঁরা দেবার্চনায় সাহায্য করা বা জায়গাটা পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করেন। এঁদের খাবার জোগাড় ভক্তদের কাছ থেকেই হয়ে যায়। অনেকে তিন চার বা পাঁচ বছরও থাকেন মানত পূর্ণ করতে।

পাশেই কেষ্টবাজার ড্যাম, খুব বড় না হলেও মোটামুটি ভালই এবং জল সবুজ, পরিষ্কার। এখান থেকেই উঠতে লাগলাম ওপরে পাহাড়ের গা বেয়ে। চারিদিক সবুজে মোড়া। ছোটে জানাল,আপার ড্যাম থেকে জল ছেড়ে দিলে আসে লোয়ার ড্যামে। সেখান থেকে বাড়তি জল আসে কেষ্টবাজার ড্যামে। সেখান থেকে যায় খালে। এখানে তিনটে টার্বাইন আছে এবং নশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ হয়। উঠতে উঠতে দেখলাম গাড়ি এসে দাঁড়াল লোয়ার ড্যামের পাশে। ওপর থেকে দেখলাম তার ফিরোজারঙা সৌন্দর্য। তখন বেলা এগারোটা বেজে গেলেও হাল্কা কুয়াশার আস্তরণে ছেয়ে ছিল দূরের জল পাহাড় গাছপালা। মনে হচ্ছিল, লেকের সৌন্দর্যরানি তাঁর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একবারে দেখাতে একটু গররাজি। তাই হাল্কা কুয়াশার ওড়নায় মুখ ঢেকে রেখেছেন। শিল্পীরা অবশ্য তাই-ই বলেন - মুক্ত সৌন্দর্যের চেয়ে রহস্যাবৃত সৌন্দর্যই বেশি আকর্ষণীয়।

এখান থেকে গেলাম আপার ড্যামে। সে এক বিশাল জলাধার। সবুজ জলের ওপর পাক খেয়ে যাচ্ছে একঝাঁক পরিযায়ী পাখি। চারধারে সবুজের সমারোহ। তার সঙ্গে মিশেছে আকাশের মেঘধোওয়া নীলের ধারা। সব মিলিয়ে সে এক অনির্বচনীয় শোভা।

আপার ড্যাম - অযোধ্যা পাহাড়

দু-একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ধারটা কাঁটাতারের বেড়ার বন্ধনীতে। ব্যারেজের ঢোকার মুখেই দেখলাম একজন প্রহরী। ব্যারেজে মাছেরও চাষ হয়। প্রচুর মাছ ধরাও হয়।

পৌঁছলাম ময়ূরপাহাড়ে। সেটিই নাকি অযোধ্যা পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া। ছোট টিলামত। ওপরে উঠে চারপাশের দৃশ্য খুব সুন্দর। হাসতে হাসতে বললাম,ময়ূর পাহাড়,নামটি বেশ সুন্দর; কিন্তু ময়ূর তো ধারেকাছে দেখছি না। বলতে বলতেই গাড়ি এসে দাঁড়াল একটি চাষির কুঁড়ে লাগোয়া জমির পাশে। দেখি সেখানে পায়ে দড়ি বাঁধা মুরগির মত দুটি ময়ূর বাঁধা। ছোটে বলল,এখানে ময়ূর পাওয়াও যায়। লোকে ময়ূরের ডিম জোগাড় করে মুরগি দিয়ে সেই ডিম ফোটায়। তারপর বিক্রি করে। পরে অবশ্য একটা বন ময়ূরও দেখেছি। আর রাস্তার ধারে যে সমস্ত কুঁড়েঘরগুলো দেখছিলাম,তাদের গায়ে যে কী সুন্দর রঙ বেরং-এর চিত্রবিচিত্র শিল্পকর্ম করা আছে কি বলব। মন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

এবারে যাওয়া মার্বেল লেকে। কেউ বলে ব্লু লেক। এটি আর কিছুই নয়,পাহাড়ের পাথর কেটে গভীর খাদ হয়েছে এবং তাতে পরিষ্কার জল জমে রয়েছে। চারধারে গ্রানাইটজাতীয় পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। আর শক্ত পাথর থাকার জন্য খাদের মধ্যের জল,কাছাকাছি মাটির সঙ্গে না মিশতে পারায় একেবারে স্বচ্ছ ও নীল।

এখানে এসে জানতে পারলাম একটি অভাগী মেয়ের কাহিনি। লেকের কাকচক্ষু জলের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখি সতের-আঠারো বছর বয়সের একটি মেয়ে,অসংলগ্ন পায়ে পায়ে, এগিয়ে গিয়ে আমাদের পেরিয়ে জলের ধারে উঁচু পাথরের ওপর বসল। চোখে কেমন একটা বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টি। দেখে, ঠিক বিদেশি যে "মারমেড"এর মূর্তি দেখেছি তার কথা মনে হল। আদিবাসী ঘরের অশিক্ষিতা কন্যা,মলিন বেশবাসে,অযত্নলালিত একঢাল কেশরাশি ছড়িয়ে অনাদৃতা রূপ-যৌবন নিয়ে একরাশ বিষণ্ণতা মেখে মলিন হয়ে বসে আছে। খানিকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল। তারপর আমি ছবি নিচ্ছি দেখে আমায় কাছে ডেকে বলল,আমার একটা ছবি নে। নিলাম। তখন ও নানা অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করল।ওর হাবেভাবে একটু অসঙ্গতি লক্ষ্য করে আর সাড়া দিলাম না। ফেরার পথ ধরলাম। পরে আশপাশের লোকের থেকে শুনলাম ওর বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ির লোক ওকে গ্রহণ করেনি, অন্যজাতের মেয়ে বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। মনে হল,এই আমাদের দেশের মেয়েদের প্রকৃত ছবি,সে শিক্ষিতা না অশিক্ষিতা সেটা বড় কথা নয়। শিক্ষিত উচ্চবিত্ত/মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত আদিবাসী সমাজের আজও এই জায়গাটায় বড়ই মিল।

মার্বেল লেক

হোটেলে ফিরে এলাম, তখন বেলা দেড়টা। হাল্কা মুসুরির ডাল, বেগুনভাজা, চচ্চড়ি, মাছ, পাঁপড়ভাজা, চাটনি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে বিকালে গেলাম খয়রাবেরা ইরিগেশন ড্যাম দেখতে। বেশ সুন্দর নিরিবিলি জায়গা। চারধারে উঁচু পাহাড়ঘেরা সবুজ জঙ্গলে মোড়া। সবুজ পাহাড়ের ছায়া বুকে নিয়ে নিস্তরঙ্গ জল নির্বিকার শুয়ে আছে। ওদিকে শেষ বেলার সূর্য রাঙা আলোয় আকাশ রাঙিয়ে বাড়তি রঙটুকু ঢেলে দিয়েছে লেকের জলে। পাশে গড়ে উঠেছে একটি রিসর্ট ঠিক পাহাড়ের নীচে লেকের ধারটিতে। যেন ঠিক একটি মূর্তিমান অসুন্দর। এই সৌন্দর্যের পাশে সার্থক বেমানান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ড্যামের ধারে শুধু পলাশ, বনশিউলি আর শালের সবুজ জঙ্গল। রাস্তায় যেতে যেতে দেখি প্রচুর কুলের গাছ। ড্রাইভার আর ছোটে নতুন জানাল,এখানে প্রচুর লাক্ষাচাষ হয় - কুল,পলাশ আর কুসুম গাছে। চাষিরা লাক্ষার রঙ দেখে বুঝতে পারে কখন সেগুলো তোলার সময় হয়েছে। যেখানে যেখানে,যেসব ডালে লাক্ষা হয় সেগুলো কেটে নেয়। ডাল থেকে চেঁছে বা ডালগুলো ছোট করে কেটে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে। বরাভূমে এর প্রচুর গুদাম আছে। ওখানে ওরা আগুনে গরম করে বা নানা প্রক্রিয়ায় গাছের ডাল থেকে আলাদা করে। তারপর সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় যায়। রাজস্থান এর বড় খরিদ্দার। ওখানে যে গালার চুড়ি হয় তার গালা নাকি এই পুরুলিয়া জেলা থেকেই যায়। এটাও আমার কাছে নতুন তথ্য।

ফেরার সময় রাস্তায় দেখি গোটা রাস্তা জুড়ে গরু আর ছাগলের ঘরে ফেরার ভিড়। চলতে থাকলাম গরুর দলের পিছনে পিছনে। অস্তগামী সূর্যের মুখের দিকে তাকিয়ে গরুর দলের পিছনে গোধূলির প্রেক্ষাপটে যাওয়া - এ এক অন্য অভিজ্ঞতা।

অযোধ্যাপাহাড় থেকে আসতে আসতে ছোটে শোনাচ্ছিল কয়েক বছর আগের কথা যখন মাওবাদীদের ভয়ে এখানে কেউ আসত না। এই অযোধ্যা পাহাড়ে ওরাও আসতে ভয় পেত। তখন এই ড্যাম ছিল না,এত রাস্তা, আলো কিছুই ছিলনা। শোনাল শিক্ষিত কম্যাণ্ডার বিপ্লব

ব্যানার্জীর কথা,যিনি ছিলেন এই পুরো এলাকার দায়িত্বে। পুলিশ তাঁকে যখন এনকাউন্টারে হত্যা করে,তাঁর মা-বাবাও তাঁকে সন্তান হিসাবে অস্বীকার করেন। তবে এখন এলাকা পুরো শান্ত,মানুষের এখন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে সরকারি সাহায্য পেয়ে।

এক জায়গায় দেখলাম বেশ কিছু মহুয়ার গাছ জঙ্গলের মধ্যে। ছোটে বলল,এখানে ভালুকের খুব উৎপাত হয়। ভালুক মহুয়া খেতে ভীষণ ভালবাসে আর মহুয়া খেয়ে মাতাল হয়ে যায়। স্থানীয় আদিবাসী বাসিন্দারাও মহুয়ার তৈরি মদ খুব খায়। বিশেষ করে মেয়েরা খুব খায়। চাকরি জীবনে ঝাড়্গ্রামে দেখেছি মহুয়া যখন হয় তখন তার গন্ধেই বাতাস ম' ম' করে,গাছের তলা দিয়ে গেলেও যেন নেশা ধরে যায়। এর শুকনো ফুল খেতেও বেশ ভাল লাগে কিসমিসের মত।

রাস্তায় আসতে আসতে রাস্তায় লেখা দেখলাম চড়িদা গ্রাম। এখানে সবই হয় '-দা' নয় '-দি' যেমন ভুজুদি,সাঁওতালদি ইত্যাদি। সবই দাদা-দিদিদের ব্যাপার। চড়িদা কিন্তু আর পাঁচটা জায়গার মত নয়। এর অন্য বিশেষত্ব আছে। পুরুলিয়ার মুখোস বলতে যা বোঝায়, ছৌনাচের মুখোস,সবই এখানকার শিল্পীদের তৈরি। রাস্তার ধারে পরপর মুখোসের দোকান,সব দোকানে শিল্পীরা,শিশু প্রবীণ উভয়ই, অনবরত কাজ করে চলেছেন। আমরা অভিভূত এই শিল্পকেন্দ্রে এসে,শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। একজন বললেন,তিনি ক্লিভল্যান্ডে বিদেশি খরচে একমাস কাটিয়ে এসেছেন। কেউ বললেন তিনি সরকারি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী। অনেকে আবার ছৌ নাচেন বা তাঁদের নিজেদের দলও আছে। অর্থাৎ এখানে সবাই শিল্পী। প্রায় একশ পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে এখানে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। দেখলে মনে হবে এটাই তো একটা দর্শনীয় স্থান হিসেবে বিখ্যাত হতে পারত। কিন্তু আমাদের দেশ বলেই হয়তো তেমন কিছুই হয়নি। শিল্পীরা বেশ কষ্টেই আছেন। সরকারি দাক্ষিণ্য প্রায় কিছুই পাননি। সরকারি উদ্যোগে যে মেলা হয় এখানে ওখানে, সেখানে যান ওঁরা। কিন্তু তাঁদের ব্যবহারে ও ব্যবস্থাপনায় এঁরা বিরক্ত। এক গ্রামীণ শিল্পের স্বর্গে পৌঁছে অদ্ভুত ভাললাগায় পেয়ে বসেছিল। কিনলাম বেশ কিছু মুখোশ। তবে দরাদরি করতে ইচ্ছা হল না। হিসাব করছিলাম,কত সময় আর কত কাঁচা মাল লেগেছে,সে দাম কি আমি দিচ্ছি? মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছিল নিজের দেশের শিল্পের এই অবস্থায়। অথচ কত কাজেই তো সরকার কত কোটি কোটি টাকা হেলায় খরচ করছে।

চড়িদা গ্রামে ছৌ নাচের মুখোস তৈরিতে মগ্ন শিল্পীরা

২১/১২/১৮

আজ ভোর ছটাতেই এক বিভ্রাট। সকালে উঠে স্নান করতে যাব এমন সময় ঝুপ করে গেল অন্ধকার হয়ে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম হোটেলের বিদ্যুৎ যোগাযোগের প্রধান তারটিই পুড়ে গেছে। সারাতে বেশ সময় লাগবে। অগত্যা কী আর করা যায় চুপচাপ ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থেকে বেরোতে প্রায় বেলা এগারোটা বেজে গেল।

কথ বলছিলাম হোটেলের বয় অজয়ের সঙ্গে। ও স্থানীয় ছেলে। এখানে অল্প কিছুদিন কাজ করছে। ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম এখানে এত খেজুর গাছ দেখছি,খেজুর রস আর গুড় পাওয়া যায় না? ও বলল,হ্যাঁ পাওয়া যাবে। খাবেন? অজয় ছেলেটির ব্যবহার বেশ ভাল। ওর কথায় পুরুলিয়ার আঞ্চলিক টানটি শুনতেও বেশ লাগছিল। বললাম, যা লাগে দেব, কাল ভোরে একটু আসল খাঁটি রস খাওয়াতে হবে। আর ভাল হলে বেশ কিছু গুড়ও নেব।

আজ বেরিয়ে প্রথমে গেলাম কাছেই টুর্গা ড্যামে। এটি তুলনামূলকভাবে ছোট - কেবলমাত্র চাষের জন্য ব্যবহার হয়। সবুজ পাহাড়ের কোলে বেশ সুন্দর লাগছিল, আরও ভাল লাগছিল এর ওপরে উড়ন্ত পরিযায়ী পাখির দলের চক্রাকার আলপনা আঁকা এবং নৈঃশব্দকে খানখান করে তাদের কলকাকলি। এখান থেকে অল্প উঁচুতে উঠেই পেলাম টুর্গা ফলস। সেটা আবার বেশ নীচে এবং যদিও সিঁড়ি আছে, তবু বেশ খাড়াই বলে লোকে ওপর থেকেই দেখে। নীচে লোকে কমই যায়। এটিও ছোট ঝরনা। তবে নৈঃশব্দের মাঝে বাতাসের শিরশিরানির সাথে জঙ্গলের লতাপাতার ভিতর থেকে অনবরত ঝরঝর শব্দের একটা কনসার্ট চলেছে। তার মাঝে দাঁড়িয়ে একটা মাতাল হওয়া পরিবেশ। এইখানে বহু জায়গায় রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। তার ফলে গাড়ি চলাচলের বেশ অসুবিধা। পাহাড়ি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গেলাম বামনি ফলসের পথে। বামনি ফলস,কালকে যে লোয়ার ড্যাম দেখেছি,তাতে সমস্ত জল অবিরল ঢেলে চলেছে। এখানকার পাথরগুলো দেখলে মনে হয় পাললিক শিলা বা সেডিমেন্টেশন রক। তবে যদিও আমি ভূতত্ত্ববিদ নই, তবু মনে হল গ্রানাইট। হয়ত বহু বছর আগে সমুদ্রের তলা থেকে ঠেলে উঠেছে। বামনি ফলস যেতে গাড়ির রাস্তা থেকে বেশ নীচে নামতে হয়। সিঁড়ি যদিও আছে, কিন্তু সেগুলো পাহাড়েরই পাথর অবিন্যস্ত ভাবে পেতে তৈরি।

অনেকটা রাঁচির কাছে দশম ফলস-এর মত। নামতে অবশ্য খুব কষ্ট হয় না, তবু পর্যটন বিভাগ রাস্তাটার ভাল ব্যবস্থা করতে পারত। বেশ কিছুটা নীচে নেমে দেখা গেল পাশাপাশি দু'তিনটি ঝরনা বেশ জোরে এবং অনেকটা জল নিয়ে বয়ে চলেছে। চারধারে সবুজ গাছপালায় ঘেরা পাহাড়ের বড় বড় পাথরের ওপর দেখি সবুজ হলুদ মসের রেখা। তার সঙ্গে আশেপাশে ভিজে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে গুঁড়িগুঁড়ি ভাসন্ত জলকণার সাথে পাখি ও পাতার রহস্যময় শিরশিরানি শব্দ এক রহস্যলোকে পৌঁছে দেয়। এই জলধারা আবার আর একটু নীচের আরেকটি জলধারাকে নিয়ে মোটা জলধারা হয়ে ঝরছে। পাহাড়ের পথে অনেক জায়গাতেই দেখলাম ছোট ছোট জলধারা ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে রাস্তা পেরিয়ে গড়িয়ে চলেছে।

বামনি ফলস

এখান থেকে সাঁওতাল পল্লীর পাশ দিয়ে অনেক রাস্তা ঘুরে গেলাম তুলনামূলকভাবে কম খ্যাত সীতাকুণ্ড দেখতে। একটি মাঠের মাঝে বয়ে চলা একটি পাহাড়ি জলধারার পাশে একটি সিমেন্টের বাঁধানো ছোট কুণ্ড। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভুস ভুস করে জল উঠছে। এই জল লোকে খায়ও। গ্রামের কিছু মেয়ে-বউ পাশে স্নান করছে। তবে আমার মনে হল এটি আর্টেসীয় কূপ। এই জিনিস আমি মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম বা বাঁকুড়ার কয়েক জায়গায় দেখেছি। ঝাড়গ্রামের কিছু চাষের মাঠে চাষের জল তোলার পাইপ পাততে গিয়ে দেখা গেছে পাইপ একটু বসাতেই বেগে জল উঠতে থাকে এবং তা অনবরত বেরোতে থাকে। এই অঞ্চলে পাথরের স্তর মাটির নীচে খুব উঁচুনীচু এবং অসমান। তাই এখানে অনেক আর্টেসীয় কূপ আছে।

সীতা কুণ্ড

দুপুরে একটি হোটেলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাতায় যত্নসহকারে দেওয়া সাদা শিউলির মত ভাত,ডাল, আলুপোস্ত,আলুভাজা ও পাঁপড়ভাজা খেয়ে মনটা ভরে গেল। খিদেও পেয়েছিল খুব। তাই হোটেলের দারিদ্র্যের রঙের চেয়ে মালিকের আন্তরিকতার রং বেশি মন কেড়ে নিল। আবহাওয়া এত সুন্দর যে নীল আকাশের নীচে পাহাড় জঙ্গলের এই রাজ্যে ভীষণ ভাল লাগছে। খেয়েদেয়ে উঠতে গাড়ি ছুটল মুরুগুমা ড্যামের দিকে। রাস্তাটা খুব সুন্দর। পথের পাশে পাশে শিশু বৃক্ষের পত্তন করা হয়েছে এখন। আশা করা যায় সেগুলি বড় হলে আরও সুন্দর দেখাবে। নানান সাঁওতাল পল্লী, কুর্মী পল্লীর মাঝ দিয়ে, মুরগি, ছাগল, কুকুরকে পাশ কাটিয়ে,রাস্তা জুড়ে শুকোতে দেওয়া গম, ডালকে এড়িয়ে গাড়ি চলল মুরুগুমা ড্যামের দিকে। একে সাহারজোড় ড্যামও বলে। বাঁধটি বেশ বড় তবে এখন নাকি এটিকে আরও বড় করার জন্য আর পাড় বাঁধানোর জন্য জল কমানো হচ্ছে। তাই বাঁধে জল ভীষণ কম আর পাড়ে কর্মরত অনেক ট্রাক্টরের আনাগোনা। মনে মনে কল্পনা করলাম চারধারে পাহাড়ঘেরা জলে ভরা ড্যামটির সৌন্দর্য। লেকটির মাঝে একটি পাহাড় থাকায় সৌন্দর্য আরও বেড়েছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলেছে, তবে অস্ত যেতে দেরি আছে। সে অপেক্ষা না করে ফিরতেই হল ঐতিহাসিক দেউলঘাটার মন্দির দেখতে।

বেশ কয়েক মাইল দূরে বড়াম পেরিয়ে গেলাম বেশ ঝোপজঙ্গলে ঢাকা, নদীর ধারে,দেউলঘাটার মন্দির দেখতে। দেখে আশ্চর্য হলাম এত ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন মন্দির অঞ্চলের কোন রক্ষার বা যত্নের ব্যবস্থা নেই! অবশ্য আমরা আমাদের কোন্ ইতিহাসেরই বা গুরুত্ব দিয়েছি? হেলায় এসব নষ্ট করছি। মন্দির একটি নয় দুটি। একই রকম দেখতে পাশাপাশি দুটি লম্বাটে টেরাকোটা কাজের মন্দির। বোধহয় সেন, পাল বা গুপ্তযুগের মন্দির। শিবের মন্দির। মন্দিরগাত্রে যা কিছু শিল্পকাজ ছিল, আজ আর তা বোঝা যায়না। টুকরোটাকরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। মন্দিরগুলির সম্প্রতি সংস্কার হয়েছে। তবে অপটু হাতে সংস্কার আর কবে আসলের মত হয়? শিল্পনন্দন তো আর হয়না। মন্দিরদুটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা গেছে মাত্র। মন্দিরচত্বরটি মোটামুটি পরিষ্কার করা। তবে নিত্যপূজা হলে যে পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতার চিহ্ন থাকে, তা নেই। দর্শনস্থান হিসাবে পরিষ্কার আছে। এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল। তিনিই ডেকে আলাপ করলেন। জানালেন এই নির্বান্ধব পুরীতে তিনি আটত্রিশ বছর আছেন। প্রথমে ওঁকে অশিক্ষিতা আশ্রমবাসিনী ভৈরবী ভেবেছিলাম। শীঘ্রই ভুল ভাঙল। উনি বলতে লাগলেন মন্দিরের ইতিহাস। জানলাম এগুলি মহাযান বৌদ্ধধর্মের মন্দির। পরে শিবের মন্দির হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। সেন, পাল বা গুপ্ত যুগে যখন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের রমরমা, তখন বাংলার অনেক জায়গায় বৌদ্ধ মন্দির তৈরি হয়। তার প্রমাণ দেখালেন পাশে তৈরি চারটি ছোট ঘরে চারটি মূর্তি দেখিয়ে। মূর্তিগুলির বিশ্লেষণ করে বোঝালেন সেগুলি জগদ্ধাত্রী,দুর্গা ইত্যাদি হিন্দু বা আর্য দেবদেবীর মূর্তি হলেও তাতে বৌদ্ধপ্রভাব থাকায় সেগুলি ঠিক হিন্দুমূর্তি হয়নি। পরে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন,উনি বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর হন। পরে দীর্ঘদিন স্কুল চালান।

দেউলঘাটার মন্দির

পরে এব্যাপারে দেখছিলাম যে,পণ্ডিতেরা বলছেন, বৌদ্ধমন্দির নয়, এগুলি জৈন মন্দির। আসলে কাছাকাছি তিনটি একই রকমের মন্দির ছিল তার মধ্যে এই দুটি পাশাপাশি,একটা একটু দূরে। বর্তমানে এই দুটিই টিঁকে আছে। দুটিতেই কিছু অশৈল্পিক রীতিতে সংস্কার হয়েছে। অবশ্য উপায়ও নেই,সেই ধরণের শিল্পীকে আজ পাওয়া মুস্কিল। এগুলি তৈরির সময়টা ওই দশম একাদশ শতাব্দী - যখন পাল বা সেন যুগ চলছে। সেইসময় এইসব অঞ্চল অর্থাৎ বাঁকুড়া-পুরুলিয়া, রাজা অনন্ত বর্মণ চোড় গঙ্গদেব দখল করেন। তিনি জৈনধর্মে বিশ্বাসী হওয়ায় রাজানুকুল্যে বেশ কিছু জৈন মন্দির গড়ে ওঠে। কাছাকাছি জায়গা পাকবিরা বা বান্দা অঞ্চলে এখনও যে সমসাময়িক মন্দিরগুলি রয়েছে, সেগুলি দেখলেই এগুলি যে দিগম্বর জৈন মন্দির তা বোঝা যাবে। সেখানে মন্দিরের দেওয়ালে ও নানা জায়গায় পার্শ্বনাথের মূর্তি রয়েছে। পরবর্তী কালে এগুলি পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু মন্দির - শিবের বা বিষ্ণুর মন্দির হিসাবে টিঁকে থাকে। পাশের নদীটি কাঁসাই বা কংসাবতী। বিচিত্র সুন্দর কালো সাদা, বড় বড় পাথর ইতস্তত নদীর বুকে ছড়ানো। তার ফাঁক দিয়ে খরস্রোতা নদীটি এঁকেবেঁকে চলেছে। মন্দিরচত্বর থেকে একটা সিঁড়ি ধাপে ধাপে নদীর বুকে নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে নেমে গেছে। পাথরগুলি কিন্তু সত্যিই মন কাড়ে - একটা পাথরের একপাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ, অপর পাশ গৌরবর্ণ - প্রকৃতির কী বিচিত্র শিল্পকলা। যে তিনটি মন্দির ছিল, তারমধ্যে যেটি সবথেকে বড় সেটি নাকি ২০০২ সালে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে। সেখানে আজ কিছু পাথরের ধ্বংসস্তুপ ছাড়া আর কিছু নেই।

তবে মন্দিরের আশপাশটি বড় সুন্দর। চারদিকে বড় বড় গাছে ঘেরা, ছায়ার আদরমাখা আশ্রমিক পরিবেশ। গাছে গাছে টিয়াপাখি এবং আরও নানা পাখির ঝাঁক -চতুর্দিক কলকাকলিতে মুখর। আমার ঠিক বিদ্যাসাগরমশাই এর লেখা 'শকুন্তলা'র কণ্বমুনির আশ্রমের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

যেতে মন চাইছিল না তবু যেতে হল। বেলাও পড়ে এসেছে - সন্ধে হয়ে এলে তো কিছুই আর দেখা যাবেনা। তার ওপর শীতের বেলা তো খুব তাড়াতাড়িই ফুরিয়ে যায়।

২২/১২/১৮

সকাল-সকালই বেরোতে হল হোটেল ছেড়ে। কারণ আজ রাতেই ফেরার ট্রেন। সারাদিন ঘুরেবেড়িয়ে সোজা চলে যাব পুরুলিয়া স্টেশনে। তারজন্য ব্যাগ গোছানোর সঙ্গে আরও একটি প্রয়োজনীয় কাজ সেরে রেখেছিলাম - গতকাল হোটেলের ছেলে অজয়কে বলে স্থানীয় দোকান থেকে বেশখানিক খেজুরের গুড় আনিয়ে নিয়েছিলাম। কলকাতার দোকানে যে গুড় পাওয়া যায়, তার না আছে স্বাদ না আছে গন্ধ। এ গুড়টি একেবারে খাঁটি কিনা জানিনা, তবে আমরা যে গুড় পাই তার থেকে অনেক ভাল। খুব ভোরে অজয় কিছুটা খেজুর রসও খাইয়েছে। রসের স্বাদটিও বেশ ভাল। খেজুরের রসের সঙ্গে ছেলেবেলাটাকে কিছুটা হলেও ফিরে পেলাম, যদিও বেশি রস খাওয়ার সাহস হয় নি। আজ গাড়ি নিয়ে এসেছে প্রথম দিনের ছেলেটি অর্থাৎ ছোটে। ছোটে বললেই মনে হয় বলি 'ছোটে নবাব।' অবশ্য ওকে এই গাড়ির নবাব-ই মনে হচ্ছিল। গাড়িটি একেবারে নতুন, এখনও নম্বর পড়েনি। বলল যে গাড়িটা ওর নিজের -সেটা অবশ্য ওর যত্ন দেখেই বুঝেছিলাম। লোকে নতুন বউকে যেমন যত্ন করে,ঠিক তেমনি যত্ন করছে। আর তেমনই নবাবি ওর হাবভাব। তবে ছেলেটির ব্যবহার খুবই ভাল।

আজ গাড়ি প্রথম থেকেই একটু উড়ুউড়ু মেজাজে। কারণটা পরে বুঝলাম। আজ তাকে কোন আজেবাজে রাস্তায় যেতে হবে না। সোজা ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে ঝড়ের মত উড়ে চলবে। প্রথমেই গেলাম মাঠা রেঞ্জের জঙ্গলে। শাল-সেগুনের ঘন জঙ্গল। তবে তখনও তার ঘুম ভাঙেনি। সবেমাত্র বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গছে। অল্প অল্প পাখিদের কাকলি শোনা যাচ্ছে। আর গাছের ফাঁক দিয়ে মিষ্টি লাজুক রোদের ঘোমটা পরা দুষ্টু-মিষ্টি হাসিমুখ একটু একটু করে লুকিয়ে-চুরিয়ে উঁকি মারছে। তার সঙ্গে খেলায় না মেতে আমরা এগোলাম পাখিপাহাড়ের দিকে।

পাখিপাহাড় নামটার মধ্যেই কেমন যেন একটা রোমাঞ্চের গন্ধ আছে যা শুনলেই মনটা কেমন যেন আনচান করে ওঠে। কাছে গিয়ে দেখি শালের জঙ্গলের মধ্যে একটা একেবারে উদোম পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলের বাইরে থেকে শুধু মাথাটুকুই দেখা যায়। গায়ে রয়েছে নানা আঁকিবুঁকি সাদা সাদা দাগের। ঢুকলাম শালের জঙ্গলের মধ্যে - নির্দিষ্ট কোন বাঁধাধরা পথ নেই। এতেই যেন প্রকৃতিকে ঠিক রূপে পাওয়া যাচ্ছে এখানে। যত ভেতরে ঢুকলাম ততই যেন আশ্চর্যের সীমা হারিয়ে যেতে লাগল। দেখি পাহাড়ের গোড়ায় ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা অনেক পাথরের গায়ে বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানা পাখি, খরগোশ, প্যাঙ্গোলিন বা অন্য প্রাণীর ছবি। তবে তার মধ্যে পাখিটাই বেশী। আর পাহাড়ের মাথা থেকে গোটা গায়ে যে আঁকিবুঁকি দেখছিলাম তা নিছক আঁকা নয়,সেগুলো সব বহু পাখির ছবি খোদাই করা। বোঝা গেল কেন এটার নাম পাখিপাহাড়। শুনলাম এই পাহাড়ের বৃত্তান্ত।

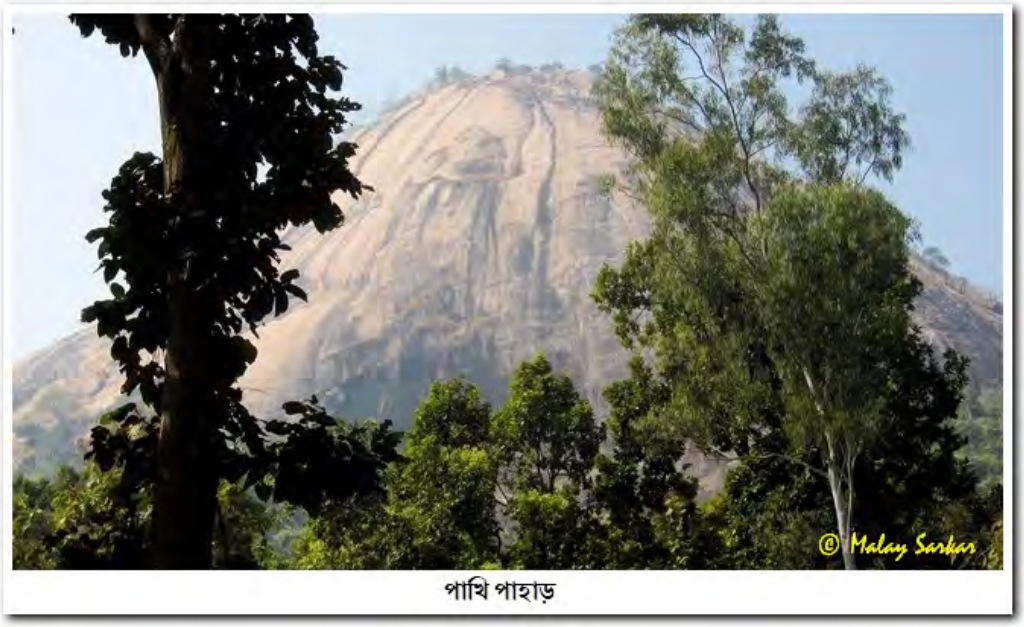

পাখি পাহাড়

শিল্পী শ্রী চিত্ত দে-র শৈল্পিক পাগলামির ফসল এই সুন্দর পাখিপাহাড়, যা আজ নানান শিল্পবোদ্ধা ও সৌন্দর্যরসিক পর্যটককে টেনে আনে পুরুলিয়ার এই অখ্যাত মাঠা রেঞ্জের জঙ্গলে। গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের প্রাক্তনী ভাস্কর চিত্ত দে দুই দশকের বেশি সময় যাবৎ স্থানীয় আদিবাসী যুবকদের কাজে আকৃষ্ট করে,তাদের শিক্ষা দিয়ে এই সুবিশাল কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। কীভাবে যে তিনি এই বিশাল কাজ করছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ৮০০ ফুট উঁচু এই পাখিপাহাড়ের গায়ে এখনো অবধি প্রায় পঁয়ষট্টিটি পাখি চিত্রিত হয়েছে,পরিকল্পনা আছে শতাধিক পাখি আঁকার। এখানে সবচেয়ে বড় পাখিটি প্রায় ১২০ ফুট ও সবচেয়ে ছোটটি ৫৫ ফুট বিস্তৃত পক্ষ। শিল্পী প্রায় সারা ভারত ঘুরেছেন একটা সুযোগ্য কাজের ক্ষেত্র খুঁজে। শেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁকে এই মাঠাবুরু রেঞ্জের পাহাড়টিতে কাজ করতে দেন। বিভিন্ন সংশোধনাগারফেরতদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে শিল্পী ১৯৯৭-এ এই কাজটি শুরু করেন। এই কাজ এখনও অসমাপ্ত, তবে এখনই এর খ্যাতি ছড়িয়েছে বেশ।

এখানে জঙ্গলে ঢুকে পাহাড়ের কাজ দেখছি এমন সময় দেখি একদল বন হরিণীর মত একটা বুনো ছন্দে সেই ভোরের বেলায়, যখন জঙ্গলের ভিতরে সূর্যের আলোও আড়মোড়া ছেড়ে ঢোকেনি, নানা বর্ণের শাড়ি পরে চলেছে একদল মাঝবয়সী মেয়ে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় চলেছ? জানলাম কাঠ কুড়াতে। হাতে তাদের একটি ছোট কাটারিগোছের। বললাম, কখন ফিরবে? চলতে চলতেই বলল, সাঁজ বেলায়।

-খাবে কী সারাদিন?

- সারাদিন আর খাব না, ভোরে পান্তা খেয়ে বেরাইছি। একেবারে সাঁজবেলায় বাড়ি গিয়ে খাব ।

-জল পাবে কোথায়?

কোমরের গেঁজে থেকে একটি প্লাস্টিকের জলের বোতল দেখিয়ে বলল, ঘর থেকে নিয়ে বেরাইছি।

বলতে বলতেই চলে গেল অনেক দূর, চোখের বাইরে জঙ্গলের আড়ালে। কতক্ষণ তাদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মন ফিরল পাখিপাহাড়ের কোলে। ভাবছিলাম এরাই তো প্রকৃতির বুনো পাখি।

পাখি পাহাড়ের আশেপাশে চিত্রিত প্রস্তরখণ্ড

ছুট লাগালাম একেবারে সোজা গড় পঞ্চকোট। মাঝে পড়ল পুরুলিয়া শহর। বেশ জমজমাট শহর ছাড়িয়ে আবার হাইওয়ে ধরে ছুটলাম। আনাড়া, বেগুনকোদর ইত্যাদি সব জায়গা, বসতি, ছোট ছোট বাজার আর আদিগন্তবিস্তৃত খোলা মাঠ যার দিকে তাকালে মনটাও প্রশস্ত হয়ে যায়। প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ পৌঁছালাম ইতিহাস বিস্মৃত গড়পঞ্চকোটে। শেষের দিকে বেশ খানিকটা জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তার পর ঢোকা গেল ঈপ্সিত স্থানে। দূরে দেখা যাচ্ছে সবুজ ঢাকা পঞ্চকোট পাহাড়। তার কোলে সরকারি আবাস বেশ দৃষ্টিনন্দন, শুনলাম আগে থেকে ব্যবস্থা করে এখানে থাকা যায়। কাছেই রয়েছে পাঞ্চেত ড্যাম। তবে আমাদের সময় কম বলে এবং অনেক ড্যাম দেখা হয়েছে আগে, সেজন্যও বটে, আমরা ড্যামে সময় নষ্ট না করে ইতিহাস দেখতেই আগে পছন্দ করলাম।

গড় পঞ্চকোটে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

ঢোকার মুখেই দেখি একটি বেল গাছের তলায় মাথাখোলা ছোট একখানি খুপড়ি, পাথরের তৈরি। এককালে তা নাকি মন্দির ছিল, রাজপরিবারের দেবী কল্যাণেশ্বরীর। সেই মূর্তিই এখন পূজিত হচ্ছেন মাইথনে। তার পাশেই রয়েছে এক পঞ্চচূড়া বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা

মন্দিরের আদলে এক মন্দির,পঞ্চরত্ন মন্দির, যা বেশ কিছুটা সংস্কার করা হয়েছে,তবে অন্যান্য অনেক মন্দিরের মধ্যে এটাই এখনও দাঁড়িয়ে আছে কালের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে।

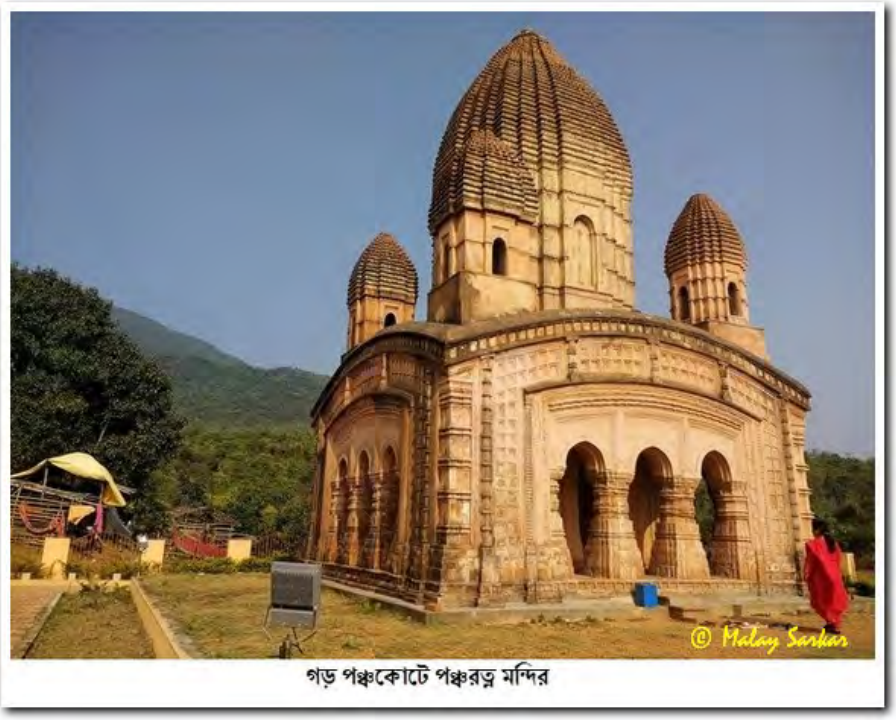

গড় পঞ্চকোটে পঞ্চরত্ন মন্দির

পঞ্চকোট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় একটা দোকানে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারা গেল। তারপরে প্রায় পড়ন্ত দুপুরে পৌঁছলাম জয়চণ্ডীপাহাড়ের তলায়। এই পাহাড়ের সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে সত্যজিৎ রায়ের নাম তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি 'হীরক রাজার দেশে'র শ্যুটিং-এর জন্য। তবে তার থেকেও বড় হল দেবীর মহিমা। পাহাড়ের মাথায় দেবীর মন্দির। ওপরে ওঠার জন্যসুন্দর সিঁড়ি আছে। তাতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা বয়স্কদের জন্য মাঝে মাঝে বসার ব্যবস্থাও আছে। সিঁড়িগুলি বেশ চওড়া এবং সুন্দর। সিঁড়িতে ওঠার মুখেই আছে একটি গেট বা তোরণ। মন্দিরে পৌঁছানোর একটু আগে বাঁকের মুখে আছে একটি পুরানো ওয়াচ টাওয়ার। এটি ছিল স্থানীয় কাশীপুর রাজার ওয়াচ টাওয়ার। রাজার রাজবাড়ি প্রায় কুড়ি কিমি দূর। তবে এখন তালাবন্ধ। তাই আমাদের ড্রাইভার বৃথা যেতে রাজি হল না। ওপরে উঠে মনটা ভরে গেল। পাহাড়ের মাথাটা বেশ চওড়া। সেখানে বাহুল্যবর্জিত ছোট্ট মন্দিরে চন্ডীমাতা বিরাজ করছেন। পাশে আছে বজরংবলীর মন্দির। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে দূরে আদ্রা-বাঁকুড়া লাইনের জয়চণ্ডীপাহাড় স্টেশন। এছাড়াও বহুদূরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যায়। বেশ একটা অদ্ভুত ভালোলাগা কাজ করে।
সামনেই আসছে একটি মেলা। তার জন্য গোছগাছ, ম্যারাপবাঁধা শুরু হয়েছে দেখলাম।

বেশকিছুটা সময় আগেই পৌঁছে গেলাম পুরুলিয়া রেল স্টেশনে। কতকিছু দেখলাম, তবু মনে হল এখনও অনেক কিছুই দেখা হল না। ভারতবর্ষ তো অনেক বড় ব্যাপার,আমাদের ঘরের কাছে বাংলার অন্দরমহলেই আরও কত সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে অবহেলিত হয়ে তাই-ই দেখা হল না। জীবন তো শেষ হয়ে এল। ভাবছিলাম আবার আসতে হবে এই মাটির টানে।

বিকেলের শেষ আলো গায়ে মেখে খরয়াবেরা ইরিগেশন ড্যাম

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক-আধিকারিক উত্তর চব্বিশ পরগণার সোদপুরের বাসিন্দা মলয় সরকার বর্তমানে আর্থিকভাবে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিয়ে কাজে বিশেষভাবে যুক্ত। এছাড়া পড়াশোনা ও লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। নেশা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ এবং উদ্যানচর্চা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

র ছবি-. লখা পাঠানোর আম ণ রইল =

তিনচুলেতে তিনদিন

মালবিকা ব্যানার্জ্জী

~ *তিনচুলের আরও ছবি* ~

গরম গরম আলুর পকোড়ায় কামড় বসাতে বসাতে কর্তা তারাভরা আকাশের তলায় দূরের পাহাড়ের গায়ে আলোমাখা এক অচিনপুরীর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, "ওই... ওই যে বাঁদিকে দূরে ঝলমল করছে..ওটা দার্জিলিং। আর পাশেরটা কালিম্পং। সামনে আলোকমালার মত যেটা দেখা যাচ্ছে,ওটা তিস্তা ভ্যালি। ওপরে টাইগার হিল,চটকপুর আর ডানদিকে ওপরে ডাউহিল!"
সামনের আবছায়া পাহাড়ের গায়ে যেন সহস্র জোনাকি জ্বলছে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছি। এতবার পাহাড়ে গেছি;তবু,পাহাড় আমাকে মুগ্ধ করে আজও।

দার্জিলিং-এ দুরাত্তির কাটিয়ে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল তিনচুলে। দার্জিলিং থেকে দূরত্ব মাত্র বত্রিশ কিমি হলেও রাস্তা খুব একটা সুবিধের নয়। গাড়িগুলো যে কারণে এটুকু পথ আসতে আড়াই হাজার টাকার চেয়ে একপয়সা কম নিল না। যাইহোক,তাকদাকে পিছনে ফেলে আমরা যখন তিনচুলে তে এসে পৌছলাম ঘড়িতে তখন দুপুর একটা। 'হামরো গেস্টহাউস'-এ আমাদের বুকিং আগে থেকেই করে রাখা ছিল। গেস্টহাউসের মালিক সুরেনজী বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে। দেখেই এক গাল হেসে অভ্যর্থনা জানালেন। ওঁর সঙ্গে ফোনে বহুবার কথা হয়েছিল এবং সেই থেকেই মানুষটি সম্পর্কে কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল। রাস্তা-লাগোয়া ছবির মত সুন্দর হোমস্টে - ফুলে ফুলে ভরা। রাস্তার উচ্চতা থেকে সিঁড়ি দিয়ে একটু নেমেই থাকবার ঘরগুলো। এখানের সব আস্তানাগুলো এই প্যাটার্নের। উনি আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। বিছানা, টেবিল, চেয়ার, টিভি, গিজার নিয়ে দারুণ সুন্দর কাঠের ঘর। ওপরে দুটি আর নীচে দুটি -মোট চারটি ঘর গেস্টহাউসে। ঘরের বারান্দা থেকেই পাহাড় দেখে দেখে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

ডাক পড়ল দুপুরের খাবারের। সুরেনজীকে আগে থেকেই কর্তা বলে রেখেছিলেন ওঁর অর্গানিক ফার্মের সবজি খাওয়ানোর জন্যে। কথামত তিনি সব ব্যবস্থা করেই রেখেছেন - গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত,ডাল,রাই শাক,নিজের খেতের সবজি,চিকেন,তিল দিয়ে বিনস ফ্রাই,দারুণ একটা আচার আর পাঁপড়। তখন,তাপমাত্রা নামতে শুরু করেছে;তার মধ্যে গরম গরম সুস্বাদু খাবার অমৃতসম লাগছিল। সুরেনজী নিজের হাতে আমাদের পরিবেশন করে খাওয়ালেন। দুপুরের খাবার খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

তিনচুলের গল্প শুরু করলেন সুরেনজী। তাকদা থেকে তিন কিমি উপরে ৫৮০০ ফুটে অবস্থিত এই গ্রামে উনুনের মত দেখতে তিনটি চূড়া ছিল, সেখান থেকেই এই নামকরণ। WWF (World Wide Fund for Nature)-এর উৎসাহে এখানকার গ্রামবাসীরা প্রায় সকলেই মডেল অর্গানিক ভিলেজ এবং ভিলেজ ট্যুরিজম শুরু করেছেন। সুরেনজী নিজেও পর্যটকদের কথা ভেবে জন্যে তৈরি করছেন অর্গানিক ফার্মিং , কমলালেবু, প্যাশন ফ্রুট, চায়ের বাগান, অ্যাংগলিং-এর ব্যবস্থা। জানালেন কাছেই একটা বৌদ্ধগুম্ফা আছে, যেখানে এক লামা দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে ধ্যান করেছিলেন।

বিকেলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম,পায়ে হেঁটে আশপাশটা একটু ঘুরে দেখবার জন্যে। রাস্তার দুপাশে দীর্ঘ পাইনের সারি সূর্যালোক প্রবেশে বাধা দেয়। জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে ঝিঁ-ঝিঁ-র ডাক,সঙ্গে অচেনা বুনো ফুলের গন্ধ। ইতিউতি বনমুরগিরা দৌড়ে ঢুকে যাচ্ছে জঙ্গলে। সামনেই সেই বৌদ্ধগুম্ফাটি, নিভে আসা আলোয় যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আলোআঁধারি পথ ধরে গুম্ফাতে পৌঁছালাম,সেখানে তখন সন্ধ্যের প্রার্থনা চলছে। গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি ও দ্রিম দ্রিম বাদ্যধ্বনি এক অলৌকিক পরিবেশ তৈরি করেছে।
ফেরার পথে এক অচেনা সারমেয় বন্ধু হয়ে পুরো রাস্তা সঙ্গ দিল,যেন কতকালের চেনা। ঝরনার কুলু কুলু ধ্বনি শুনে খুঁজতে গিয়ে দেখি,আরে এতো পাইনবনের মধ্যে দিয়ে বাতাসের ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা। নেশার মতো ঝিমঝিমে।
সন্ধেবেলা গরম পকোড়া সহযোগে চা আর আড্ডা। রাতের ডিনার তাড়াতাড়ি সারলাম এবং মেনুতে যথারীতি সেই এলাহি ব্যাপার।

পরের দিন ভোরে দরজায় ঠক ঠক শব্দে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। দরজা খুলে দেখি সুরেনজী সূর্যোদয় দেখার জন্য ডাকছেন। একটা দারুণ সূর্যোদয়ের সাক্ষী থাকলাম।
আজ বেরোবো সাইট সিয়িং-এর জন্য। ন'টায় ব্রেকফাস্ট সেরে গাড়িতে উঠলাম। প্রথমেই গেলাম গুম্বাদাঁড়া ভিউ পয়েন্ট -সেখানে দিগন্ত জুড়ে সপার্ষদ তিনি - মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটা দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার নিচেই নামচি শহরটি দেখা যাচ্ছে আবছা।

পরের গন্তব্য লামাহাট্টা। পাহাড়ের ধাপে পাইন আর রংবাহারি ফুলের সমারোহ এখানে। অনেকটা চড়াই ভেঙ্গে লামাহাট্টা পার্কের এক্কেবারে উপরের 'হোলি লেক'-এ এসে পৌঁছলাম। পার্কটি থেকেও 'স্লিপিং বুদ্ধ'কে পরিষ্কার দেখা গেল।

সেখান থেকে চললাম লাভার্স পয়েন্টে। এটি তিস্তা-রঙ্গিতের সঙ্গমস্থান। কথিত আছে,কোনও এক যুগল এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেয় নীচের চড়ায়। লাভার্স পয়েন্ট থেকে গাড়ি করে নেমে এলাম তিস্তার পাড়ে। একদল বাচ্চা হৈ-হৈ করে পিকনিক করছে। ইতিউতি মাছ ধরার যন্ত্রপাতি লাগানো। কয়েকটা তাঁবুও নজরে এল। নীলচে সবুজ তিস্তাকে ছুঁয়ে দেখলাম জলে নেমে। ফেরার পথে রাস্তায় পেশক চা বাগান দেখে নিলাম।

আমাদের শেষ গন্তব্য ছিল বড়ামাঙ্গওয়ার অরেঞ্জ গার্ডেন। তিরিশ টাকা মাথাপিছু টিকিট কেটে গাইড সহযোগে গার্ডেনে ঢোকা যায়। এসময় বাগান উপচে পড়ছে কমলালেবুর ভারে। নিচে একটি জুস ফ্যাক্টরিও আছে। বেলা পড়ে আসছে,সাথে পেট চুঁইচুঁই। এবার ফেরার পালা। তিনচুলেতে ফিরে দেখলাম সুরেনজী হাসিমুখে বসে রয়েছেন লাঞ্চ রেডি করে। এখানে ঝুপ করে সন্ধে নেমে আসে। সন্ধ্যের পর বিশেষ কিছু করার থাকে না। কটেজের লনে বসে সুরেনজীর সাথে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। সে গল্পে উঠে এল ওখানকার আপাত সাদামাটা মানুষগুলোর জীবনযাপন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিংবা সুরেনজীর ইকোট্যুরিজমের প্রেরণার উৎস। রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন ফেরার টিকিট বাগডোগরা থেকে ১০.৩০ এর ফ্লাইটে। ভোর ছটাতেই গাড়ি চলে আসলো। এত সকালেও ভাবিজী আমাদের জন্যে যত্ন করে পুরি-সবজি বানিয়ে দিয়েছেন। সুরেনজীর মা ও স্ত্রী খাদা পড়িয়ে বিদায় দিলেন। বারবার বললেন, আবার যেন আসি। একরাশ মনখারাপ নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। আবার সেই ইট-কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে ফেরা।

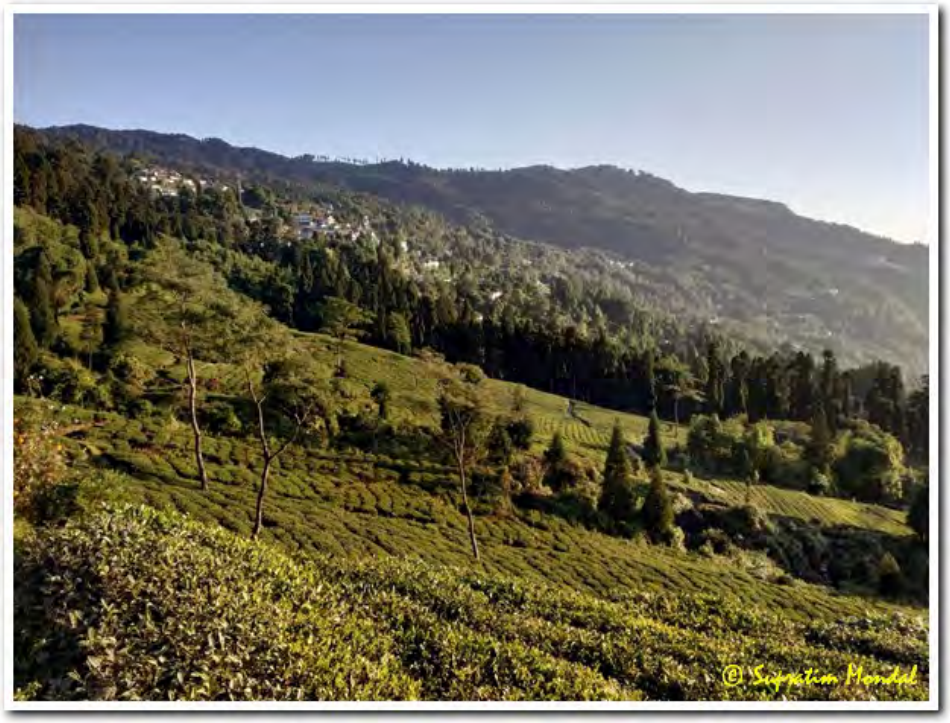

ফেরার পথে দেখলাম অপূর্ব সুন্দর তিনটি চা-বাগান -'রংলি -রংলিয়ট', 'গিয়েল' আর 'তিস্তা ভ্যালি'। যতদূর চোখ যায় মনমাতানো সবুজের গালিচা বিছানো আর নীল পাহাড়ের বুকে আলগোছে আটকে থাকা মেঘের দল। মনটা ভারি হয়ে আসছে। আসলে,তিনচুলের উষ্ণতা তখন জড়িয়ে ধরেছে মনের প্রতিটি খাঁজে আর তাই গাল বেয়ে নামছে নোনা ধারা।

~ *তিনচুলের আরও ছবি* ~

কর্পোরেট বিজ্ঞান গবেষক মালবিকা ব্যানার্জী নেশায় ভ্রামণিক। ভালোবাসেন বেড়িয়ে এসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেইসব ভ্রমণকাহিনি লিখতে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

র ছবি-. লখা পাঠানোর আম ণ রইল =

গোয়েচা লা-র পথে

সুদীপ্ত ঘোষ

~ *জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেকরুট ম্যাপ* ~ *জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেকের আরও ছবি* ~

প্রাককথন

সব গল্পেরই একটা শুরু শেষ থাকে। সব ঘটনারও তাই। কিছু জিনিস নিয়ম মেনে হয় না, আর হয় না বলেই জীবন এত মজার। এই ভনিতা কেন সে কথা বলি। শুরুর সেই দিন, তারিখ বা সময়টা ঠিকঠাক মনে নেই, সম্ভবত জুনের মাঝামাঝি, জুলাই বা অগাস্ট হলেও ক্ষতি নেই। অফিসের ব্যস্ত সময়ে হঠাৎ বাপ্পার ফোন "সুদীপ্ত দা, নভেম্বরে 'গোয়েচা লা' ট্রেক, আর তুই যাচ্ছিস।" কিছু বলার আগেই ফোন কাট। এরপর অফিস, ফিল্ড, ট্রেনিং-এর নেভার এন্ডিং চাপে দিমাগ থেকে গোয়েচালা গন। সেপ্টেম্বরে টিকিট বুকিং কবে হল, টিমে কারা আছে, কারা নেই কিস্যু জানি না। জায়গাটা নিয়ে পড়াশোনা, হোমওয়ার্ক কিছুই করতে পারি নি। যদিও পরবর্তীকালে সেটা শাপে বর মনে হয়েছে কখনও কখনও। মাঝে মাঝে বাপ্পার মেসেজ 'কলকাতার টিকিটটা কাট। আমাদের বাকি বুকিং কমপ্লিট। 'লাকি' গাইডের ব্যাপারটা ফাইনাল করে ফেলেছে।' আমার অবস্থা শোচনীয়, কিভাবে ম্যানেজ দেব কিছুই বুঝতে পারছি না। একদিকে এতদিনের বন্ধুত্ব, পাহাড়ের হাতছানি, অন্যদিকে অফিসের চোখরাঙানি। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত আবার ইলেকশন ডিউটির ভ্রূকুটি। যাই হোক, সব কিছু কাটিয়ে শেষ মুহূর্তে অফিসকে সামলে রুকস্যাক পিঠে বেরিয়ে পড়লাম। জয়পুর থেকে কলকাতা হয়ে বাউরিয়া। রাতটুকু বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন প্যাকিং-এর ফাইনাল টাচ সেরে রাতের ট্রেনে চেপে পড়লাম। পনেরো জনের বড় দল। কিছু চেনা, কিছু অচেনা মুখ। থোড়াই কেয়ার। 'যদি হও সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন।' 'ন'জন যদি হতে পারে, 'পনেরো' জনে কেন নয়? শিয়ালদহ থেকে 'কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস' যখন ছাড়ল ঘড়িতে তখন 'আটটা কুড়ি।' ন' টা নাগাদ বাকিদের ব্যাগ থেকে উঁকি দিতে শুরু করেছে নানান সাইজের টিফিন বক্স। লুচি, পরোটা, তরকারি, আলুরদম, সুজির হালুয়ার গন্ধে বাঙালি তখন বিপ্লবী। সদ্য আলাপের ভদ্রতার আচ্ছাদন সরিয়ে রেখে প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়লাম লুচি পরোটার উদ্দেশে। কয়েকঘন্টার আলাপ যে কখন বন্ধুত্বে বদলে গেছে, তখনও বুঝতে পারি নি।

১২ নভেম্বর, ২০১৮

সকালে ঘুম ভাঙল পাঁচটা নাগাদ। বাকিরা গভীর ঘুমে। ট্রেন রাইট টাইম। চা খেয়ে ফ্রেশ হয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালাম। রেললাইনের ধারে ঢালু জমি বেয়ে ছোট ছোট চা বাগান, সব্জির খেত। ঝকঝকে আকাশে সোনাঝরা রোদ। ট্রেন নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাল সাড়ে সাতটা নাগাদ। লটবহর নিয়ে ওয়েটিং রুম। স্নান করে, ব্রেকফাস্ট সেরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। দুটো গাড়িতে মালপত্র বাঁধাছাঁদা সেরে, নারকোল ফাটিয়ে, 'দুগগা' বলে যাত্রা শুরু হল।

গন্তব্য ইয়ুকসাম। প্রাচীন সিকিমের রাজধানী। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দূরত্ব প্রায় দেড়শো কিলোমিটার। গাড়িতে প্রায় ঘন্টা ছয়েকের রাস্তা। যদিও পাহাড়ি রাস্তায় দূরত্ব আর সময়ের অহি-নকুল সম্পর্কের কথা সবারই কম বেশি জানা। ষ্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। শহর ছাড়িয়ে এসে পড়েছি মিলিটারি চৌহদ্দিতে। সবুজের ছায়া ঢাকা কালো পিচ ঢালা রাস্তা। পাশে দাম্ভিক শাল, সেগুনের জঙ্গল। চিরহরিৎ অরণ্যের 'উচ্চ যেথা শিরের' ভিড়ে, নিজের অজান্তেই 'চিত্ত ভয়শূন্য' হয়ে ওঠে। মহানন্দা স্যাংচুয়ারির মধ্যে দিয়ে চলা এই পথ-মাহাত্ম্য পথিক মাত্রই জানে। কালীঝোরা, রাম্বি বাজার পেরিয়ে মেল্লি পৌঁছাতে দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেল। ভাত, ডাল, শাকভাজা দিয়ে লাঞ্চ সারলাম। কিছুটা জিরিয়ে আবার চলা শুরু। তিস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম সিকিমে। তিস্তা ছেড়ে এবার সঙ্গ নিল রঙ্গিত। মেল্লি - নয়াবাজার রোড ধরে জোরথাং পৌঁছাতে বেলা পড়ে এল। রাস্তা বন্ধ। সারাই-এর কাজ চলছে। চা, শিঙাড়া সহযোগে পড়ে পাওয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করা হল। ইয়ুকসাম যখন পৌঁছালাম পাহাড়ের হিসাবে তখন যথেষ্ট রাত। ঝিরঝিরে বৃষ্টিভেজা রাতে শীতের চাদর আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরল আমাদের।

· নৈসর্গিক ইয়কসাম

১৩ নভেম্বর, ২০১৮

ট্রেকের প্রথম দিন: ইয়ুকসাম (৫,৬৪৩ফুট/১,৭২০ মি) থেকে সাচেন (৭,২০০ ফুট/ ২,১৯৫ মি)

পশ্চিম সিকিমের গেইজিং সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত ছবির মত ছোট্ট শহর ইয়ুকসাম। ইয়ুকসামের ইতিহাসও কিন্তু খুব চিত্তাকর্ষক। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে, তৎকালীন সিকিমের রাজধানী ছিল ইয়ুকসাম। অতীত ছেড়ে বর্তমানে ফিরি। সেই অর্থে, 'ট্রেকার্স ডেন' হল ইয়ুকসাম। আমাদেরও পথ চলা শুরু ইয়ুকসাম থেকে। প্রথমদিন ট্রেক ইয়ুকসাম (৫,৬৪৩ফুট/১,৭২০ মি) থেকে সাচেন (৭,২০০ ফুট/ ২,১৯৫ মি), দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। গাইডের সহায়তায় নিয়মমাফিক সইসাবুদ মিটিয়ে, প্রশাসনিক অনুমতি জোগাড় করার পর শুরু হল আমাদের পথ চলা। শুরুতে বলেছিলাম না, কিছু জিনিস নিয়ম মেনে হয় না, সেটা আরও একবার দেখা গেল। আমাদের পনেরো জনের টিমে আরও তিনজন নতুন বন্ধু জুটে গেল। একই পথের পথিক।

গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে। কালো ঝকঝকে পিচ রাস্তা ছুঁয়ে আলগোছে গোলাপি 'চেরি ব্লসম।' পশমের বলের মত পাহাড়ি কুকুর। স্কুলের পোশাক পরা কচিকাঁচার দল। এসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। পাহাড়ের প্রতিটা বাঁক তার নিজের মত করে সুন্দর। কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্কের ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার পেরিয়ে, ডানহাতি পাকদণ্ডি বেয়ে শুরু হল চড়াই। আঁকাবাঁকা সর্পিল রাস্তা বেয়ে ওঠানামা। শহুরে সভ্যতা কে পায়ে পায়ে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চলা। এ এক দুর্নিবার হাতছানি। 'কত টা পথ পেরলে তবে পথিক বলা যায়...?' উত্তর জানা নেই। 'ফা খোলা'র (Pha Khola) ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে প্রবেশ করলাম নিবিড় জঙ্গলে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশানাল পার্ক। ট্রেকের প্রথম দিনের জড়তা তখনও কাটেনি। ছবি তোলার অবকাশে ক্ষণিকের বিরতি। আবার চলা। মেঘলা আকাশে বৃষ্টির ভ্রূকুটি। সবুজ জঙ্গলে ওক, ম্যাপলের ভিড়। মাঝে মধ্যে সবুজ ক্যানভাসে গোলাপি তুলির টান, চেরি ব্লসম। একটানা ডেকে চলেছে ঝিঁঝিঁর দল। গতকাল রাতের বৃষ্টিতে পথ কোথাও কোথাও ভারী, পিচ্ছিল। পাখির কলতান, ঝিঁঝিঁর ডাক ছাপিয়ে কানে ভেসে আসছে টুংটাং ঘন্টাধ্বনি। আমাদের লটবহর নিয়ে হাজির ইয়াকের দল। দেখতে দেখতে আমাদের পেরিয়ে চলে গেল ওরা। 'সুশে খোলা' (Tshushay Khola) পার হয়ে আবার বিরতি, কিঞ্চিৎ জলযোগ। প্রতিটা ব্রিজের মজা হল অনেকটা করে উতরাইয়ে নেমে আবার চড়াই। মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে সে এক কঠিন দ্বন্দ্ব। এরপর আর একটা ব্রিজ। মেন্টোগাং খোলা (Mentogang Khola) পার হয়ে কিছুটা চড়াই ওঠার পর জঙ্গলের মধ্যে একফালি সমতল জায়গা। সার বেঁধে তাঁবু লাগানো। পৌঁছে গেছি সাচেন। আমাদের আজকের আস্তানা। পিঠের ব্যাকপ্যাক যে যার টেন্টে রেখে, কিছুটা এগিয়ে বাম দিকে নেমে এলাম। টিনের শেড ঘেরা কিচেন। পাশের শেডে কাঠের টেবিল পাতা। পাশে তিরতির করে বয়ে চলেছে পাহাড়ি ঝোরা। ঝোরার জলে হাত মুখ ধুয়ে বসতেই হাজির গরমাগরম ম্যাগি। তারপরেই ধোঁয়াওঠা চা। সারাদিনের দৈহিক ক্লান্তি মেটানোর জন্য যথেষ্ট। সন্ধ্যে নামতেই শীতটা টের পেলাম। টেন্টে ঢুকতে ইচ্ছা হল না। শেডে বসেই শুরু হল আড্ডা আর গান। অবশ্যই পাহাড়, জঙ্গলকে বিরক্ত না করে। এর মাঝেই ডিনারের জন্য ডাক। ডিনার শেষ করে ফিরে এলাম টেন্টের কাছে। আরেকদফা আড্ডার পর সেঁধোলাম স্লিপিং ব্যাগে। ছমছমে জঙ্গুলে অন্ধকার জুড়ে তখন শুধুই ঝিঁঝিঁর আর্তনাদ।

১৪ নভেম্বর, ২০১৮

দ্বিতীয় দিন: সাচেন (৭,২০০ ফুট/ ২,১৯৫ মিটার) থেকে সোকা (৯,৭০১ ফুট/২,৯৫৭ মিটার)

ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। সবুজের গন্ধ মাখা সকাল। আজকের ট্রেক সাচেন (৭,২০০ ফুট/ ২,১৯৫ মিটার) থেকে সোকা (৯,৭০১ ফুট/ ২,৯৫৭ মিটার)। দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। ঘণ্টা ছয়েকের রাস্তা। পুরি-সব্জী ব্রেকফাস্টের পর শুরু হল আমাদের পথ চলা। পাতার ফাঁক গলে আনমনা রোদের আলপনা। আকাশে তখনও মেঘের আনাগোনা। শুরুতেই ছোট অঘটন। গ্রুপের সবচেয়ে ফিট ট্রেকার প্রবীরদার পা হড়কাল। কপাল ভালো চোট লাগেনি। আবার চড়াই। নিচে প্রবহমান 'রাথং চু' নদী। বাকিদের কাছ থেকে শুনছি, জানছি এই পাহাড়, জঙ্গল, নদী। আর

দুচোখ ভরে দেখছি। অজ্ঞতা যে এত বড় আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে আগে কোনদিন ভাবিনি।

বাখিম পৌঁছানোর আগে রাস্তা খাড়াই। অনেকটা চড়াই ভেঙে আবার কিছুটা উতরাই। চতুর্থ সেতু 'প্রেক চু'র ওপর। নদী এখানে খরস্রোতা। ব্রিজে ঝোলানো রঙিন প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। সেতু পেরিয়ে কিছুটা বিশ্রাম। লক্ষ্যকে ছোট ভগ্নাংশে ভেঙে অতিক্রম করার চেষ্টা। উঁচুনিচু সর্পিল পাকদণ্ডি বেয়ে আবার চড়াই। পাহাড় জুড়ে তখন শুধুই ওক, রডোডেন্ড্রনের সারি। নিস্তরঙ্গ সময়ে মাঝে মাঝে পাখিদের কলতান। পাখিদের সেই গান শুনতে শুনতে হেঁটে চলেছি হিমালয়ের বুকে। বাতাসে তখন মুক্তির আশ্বাস। আমাদেরও বিশেষ তাড়া নেই। প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছালাম বাখিম। ছোট একটা চায়ের দোকান। একটা ভিউ পয়েন্ট। সাদামাটা, বাহুল্য বর্জিত। সামনে আদিগন্ত ইয়ুকসাম ভ্যালি। আমাদের নতুন তিন বন্ধুদের সাজেশন মেনে এক কাপ করে চা খাওয়া হল। মশলা দেওয়া। যেটা না খেলে হয়ত কিছু জিনিস অপূর্ণ রয়ে যেত। আর, কৌশিকদার মত কিছু মানুষের সান্নিধ্য জীবনে খুব জরুরি, যারা কিছু না বলতেই অনেক কিছু বুঝে যায়। না হলে জলযোগ ছাড়া বাখিমের সেই প্রকৃতিদর্শনের স্বাদ হয়ত কিছুটা কম পড়ে যেত। পাশেই একটা ফরেস্ট রেস্ট হাউস। ভূমিকম্পের পর এখন জীর্ণ দশা। ঠিক হল ফেরার পথে একটা রাত বাখিমের জন্য বরাদ্দ।

ফরেস্ট রেস্টহাউস, বাখিম

বাখিম থেকে সোকা ২ কিলোমিটার। কিন্তু প্রায় পুরোটাই চড়াই। ওয়াকিং স্টিকে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালাম। উচ্চতার হেরফের এবার সবারই কম বেশি মালুম হচ্ছে। পাহাড় চড়তে দমে টান। সোকা পৌঁছাতে প্রায় তিনটে বাজল। মেঘ, কুয়াশা ঘেরা এক বিষণ্ণ পরিবেশ। সোকার ট্রেকার্স হাটের পাশেই আমাদের টেন্ট লাগানো হয়েছে। পৌঁছানোর পর চায়ের কাপ হাতে ট্রেকার্স হাটে আড্ডা জমালাম। বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে। বিকেলেই ঘন নিকষ কালো অন্ধকার। টিমটিমে মোমের আলোকবৃত্ত ঘিরে আমরা। অঞ্জন, প্রতুল, চন্দ্রবিন্দুর সুরে গলা মেলাচ্ছি সবাই। তাল মেলাচ্ছে পাশের বিদেশী ট্রেকারের দল। সোকার ঠান্ডায় তখন বন্ধুত্বের উত্তাপ।

রাতে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। টেন্টের তলা দিয়ে ঢুকতে শুরু করেছে জল। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠান্ডা।

১৫ নভেম্বর, ২০১৮

তৃতীয় দিন: সোকা (৯,৭০১ ফুট/২,৯৫৭ মিটার) থেকে জোংরি (১৩,০২৪ ফুট/ ৩,৯৭০ মিটার)

ভোরের দিকে বৃষ্টিটা ধরে এল। আকাশ যদিও মেঘাচ্ছন্ন। সকালে মিনিট কয়েকের জন্য পান্ডিম দেখা দিয়ে আবার মুখ লুকিয়েছে। গতকাল সোকাটা ঘুরে দেখা হয় নি। এখন দেখলাম। সবুজ ঘাস জমি, কিছুটা সমতল, কিছুটা ঢেউ খেলানো। একটা ছোট্ট মনাস্ট্রি। একটা ক্যাফে। চা, কফি, চকোলেট পাওয়া যায়। গোটা দুই ক্যাম্পসাইট। একটা ফরেস্ট রেস্ট হাউস। কয়েকঘর বসতি। ট্রেকারদের অধিকাংশই ভিনদেশি। কুয়াশাঘেরা সবুজ ঘাস জমিতে চরে বেড়াচ্ছে ধূসর ঘোড়া। স্বচ্ছন্দে কোন হলিউডি ছবির দৃশ্যপট।

পাহাড়ের কোলে সেই ছোট্ট হ্যামলেট পেছনে ফেলে আবার এগিয়ে চলা। রাস্তা বেশ চড়াই। একটু হাঁটলেই হাঁফ ধরছে। আবহাওয়া রাত থেকেই খারাপ ছিল, এবার টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল। নীল ঝকঝকে আকাশ বোধহয় হাঁটার কষ্ট লাঘব করে। মেঘলা দিন, বৃষ্টির সাথে সেই সম্পর্কটা একদমই ব্যস্তানুপাতিক। আধাঘন্টা হাঁটার পর এল সেই বিখ্যাত 'রডোডেন্ড্রন ট্রেল।' ছোট ছোট গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো পথ অনেকটা ছোটবেলার ড্রয়িং খাতার সেই পাহাড়ি রাস্তা। পথে দেখা হল ফিরতি পথের ট্রেকারদের সঙ্গে। খবর পেলাম উপরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। জোংরি থেকেই ফিরতে হয়েছে। সুতরাং, আশু সাবধান।

সোকা থেকে ফেডাং -এর রাস্তার মাঝামাঝি জায়গা থেকেই শুরু হয়ে গেল 'স্নো ফল'। রডোডেন্ড্রনের জঙ্গল তখন তুষাররাজ্য। একটানা হেঁটে চলেছি, দাঁড়ালেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়হাত পা জমে যাওয়ার উপক্রম। প্রত্যেকেই অসম্ভব ক্লান্ত। ঠাণ্ডার চোটে বুই (সৌরভ) সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ল

- AMS (acute mountain sickness)। পাহাড়ে ঠান্ডা আর উচ্চতাজনিত সমস্যা। ঠিক হল একটু বিরতি দিয়ে লাঞ্চ করে নেওয়া হবে তার মধ্যে বুই সুস্থ হলে এগোনো হবে, না হলে নেমে আসা হবে। যাই হোক লাঞ্চ করে, ORS, COCA- 30 দেওয়ার পরে বুই অনেক সুস্থবোধ করায় হাঁটা শুরু হল।

তুষাররাজ্য ফেডাং

ফেডাং (১২,০৮৩ ফুট/ ৩,৬৮৩ মিটার) পৌঁছালাম একটা নাগাদ। কপালজোরে ট্রেকার্স হাটে গরম চা জুটে গেল। সঙ্গে পাহাড়ি পিঠে জাতীয় খাবার। বেশ সুস্বাদু। ফেডাং ছেড়ে জোংরি যাওয়ার জন্য, বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরলাম। ডান দিকের রাস্তা কোকচুরাং-এর। ওই পথে ফেরা। ফেডাং থেকে চড়াই। আবার জঙ্গল। বরফে ঢাকা। পায়ের তলায় বরফ কুচিতে, স্লিপ হওয়ার আশঙ্কা। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের চরিত্রগত পরিবর্তনও লক্ষণীয়। ঘন সবুজ অরণ্য শেষ হয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। তুষাররাজ্যে স্বাগত জানাচ্ছে। গাছের ডালে ছুরির ফলার মত লেগে তুষারকণা। দেওরালি টপের আগে অসুস্থ হয়ে পড়ল ওই তিন বন্ধুর একজন। দেওরালি টপে সেজন্য ক্ষণিকের বিরতি। কিঞ্চিৎ জলযোগ। প্রবীরদার বিখ্যাত কাঁচা লঙ্কা মাখা মুড়ি-চানাচুরে শীত কিছুটা হলেও কমল। দেওরালি টপ থেকে রাস্তার বাকি অংশ অপেক্ষাকৃত কম চড়াই। বরফের চাদর ঢাকা পাহাড় পেরিয়ে জোংরি পৌঁছাতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। আজকের ট্রেক সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ছিল। একসঙ্গে অনেকটা ওপরে উঠে আসা, সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। ঠান্ডা হাওয়ায় বাইরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। পারদ হিমাঙ্কের অনেকটা নিচে - প্রায় মাইনাস আট ডিগ্রি। দিনের শেষে স্মার্টফোন জানাল আজ পাড়ি দিয়েছি ৮.৪ কিলোমিটার।

১৬ নভেম্বর, ২০১৮

চতুর্থ দিন: জোংরি (১৩,০২৪ ফুট/ ৩,৯৭০ মিটার) থেকে জোংরি টপ (১৩,৭৭৮ ফুট/ ৪,২০৩ মিটার)

উচ্চতাজনিত সমস্যা, সঙ্গে অত্যধিক ঠাণ্ডায় রাতে বিন্দুমাত্র ঘুম হল না। রাতের তাপমাত্রা মাইনাস তেরো সেন্টিগ্রেডের আশেপাশে। সারাদিনের ক্লান্তি, পাহাড় চড়ার ধকল সত্ত্বেও ঘুম আসছে না। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রাতটা কাটল। ভোর চারটে নাগাদ বেরোন। জোংরি থেকে জোংরি টপ। সূর্যোদয় দেখে ফেরা। আজ রেস্ট ডে। ১৩,০০০ ফুট উচ্চতায় অ্যাক্লিমাটাইজ (acclimatize) করতে অধিকাংশ ট্রেকার এখানে একদিনের বিরতি নেন। আমাদের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি।

বরফের চাদর। ক্যাম্পসাইট জোংরি

চারটে নাগাদ তৈরি হয়ে তাঁবুর চেন খুলতেই, তাঁবুর গা বেয়ে নেমে এল একরাশ বরফ। বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিক সাদা চাদরে ঢাকা। বোতলের জল জমে কঠিন বরফ হয়ে গেছে। হেডল্যাম্পের (হেড টর্চ) গোলাকার আলোক বলয়ে তুলোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে তুহিন। সেই আলো আঁধারির মধ্যে শুরু হল আমাদের পথ চলা। হেডল্যাম্পের আলো ফেলে এগিয়ে চলেছি জোংরি টপের দিকে সঙ্গী প্রেম ভাই, স্নেহাশিস আর গাইড। চড়াই ভেঙে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে হাওয়ার দাপট। ঠান্ডাটা কিছুতেই বাগ মানছে না। শরীর গরম রাখতে একটানা চড়াই ভেঙে উঠে চলেছি। দমে টান পড়ছে প্রচণ্ড।

ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটতে শুরু করেছে। ফিকে হয়ে আসা সেই অন্ধকারে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম পাহাড়ের শিরদাঁড়া বরাবর সরু একফালি রাস্তায় আমরা কজন। জ্যামিতিক ভাষায় বৃত্তাকারে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে হিমালয়। অনেকটা সেই মহাভারতের চক্রব্যূহ। আজ বলতে বাধা নেই, সেই বিশালতার সামনে দাঁড়িয়ে বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল। পরে মনে হয়েছিল, হয়ত এটাই জীবন। শুধু জীবনের বাধার পাহাড়গুলো হয়ত হিমালয়ের মত শ্বেতশুভ্র নয়। স্নেহাশিস একে একে চিনিয়ে দিল কাঞ্চনজঙ্ঘা (৮,৫৩৪ মি), কাবরু (৭,৩৫৩ মি), মাউন্ট পান্ডিম (৬,৬৯১ মি), কুম্ভকর্ণ। আর তারপর... সূর্য উঠল। হিমালয়ের রক্তিম অভিনন্দনে শুরু হল দিন।

জোংরি টপ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ

জোংরি টপ থেকে নামার পর, নটা নাগাদ ক্যাপ্টেন বিবেকদার ডাকে জরুরি মিটিং। টিমের কয়েকজনের সামান্য শারীরিক অসুবিধা হছে। আর, নতুন বন্ধু তিনজন ফিরে যাচ্ছে। কারণ, শারীরিক অবনতি। তার উপর আবহাওয়া প্রতিকূল। মেঘে ঢেকে গেছে উপত্যকা। ঠান্ডা আরও বাড়তে চলেছে। তিনজন ফেরত যাওয়ায় আমাদের টিমের মনোবল একদম তলানিতে। অনেক আলোচনার পর শেষমেশ ঠিক হল রাতটা তাঁবুতে না কাটিয়ে ট্রেকার্স হাটে কাটাব। আর কাল যদি বাকিদের শারীরিক উন্নতি হয় উপরে উঠব নাহলে ফেরা।

ব্রেকফাস্ট করে দলের বাকিরা জোংরি টপের দিকে রওনা হল। মেঘ কেটে আবার নীল আকাশ। সামনের পাহাড়ি ঝোরা জমে বরফ। বরফে আগায় চকচকে রোদ। রোদে গা ভিজিয়ে বই খুলে বসেছে একজন। সম্ভবত রাশিয়ান। সামনে চরে বেড়াচ্ছে ইয়াক (আদতে Dzo)। গলায় বাঁধা ঘন্টার টুং টাং শব্দ ঘুরে ফিরে ভাসছে বাতাসে। নিচের উপত্যকায় একদলা সাদা মেঘ। ট্রেকার্স হাট লাগোয়া এক চিলতে দোকানে পসরা সাজিয়েছে পাহাড়ি আন্টি।

ফিরে আসার পর অনিন্দ্য বলছিল, "জোংরি টপে চড়ার সময় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, 'বেশ তো ছিলাম। কেন এত কষ্ট করছি...??' জোংরি টপে দাঁড়িয়ে সে উত্তর পেয়ে গেলাম।" হয়তো এই উত্তরটা খুঁজতেই বার বার ছুটে যাওয়া।

১৭ নভেম্বর, ২০১৮

পঞ্চম দিন: জোংরি (১৩,০২৪ ফুট/ ৩,৯৭০ মিটার) থেকে কোকচুরাং (১২,১৫২ ফুট/ ৩,৭০৪ মিটার) হয়ে থানসিং (১২,৯৪৬ ফুট/ ৩,৯৪৬ মিটার)

সকাল হল মেঘহীন আকাশে। চায়ের কাপ হাতে বাইরে দাঁড়াতেই টের পেলাম কনকনে ঠান্ডা। বরফে মোড়া চরাচর। আজকের গন্তব্য থানসিং, দূরত্ব আট কিলোমিটার। ঝরনার বরফ ভেঙে ডেকচিতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে শুরু হল দিন। ব্রেকফাস্টের পর শুরু হল হাঁটা। জোংরি আর থানসিং মোটামুটি একই উচ্চতায়। কিন্তু পথের শুরুতে খাড়া উতরাই। তারপরে চড়াই ভেঙে থানসিং।

জোংরি ক্যাম্পসাইট থেকে শুরুর হাল্কা চড়াই ভেঙে এসে পড়লাম দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ঘাসজমিতে (meadow)। পাশে পাহাড়চূড়ায় গতকালের জোংরি টপ। দূরের পাহাড়গুলো আরেকটু কাছে। কিছুটা নীচে একটা ছোট মনাস্ট্রি। পাশে গুল্ম-ঝোপে জমা বরফ। নীচ থেকে চড়াই ভেঙে উঠে আসছে ঘোড়া আর ইয়াকের একটা দল। বিবেকদা জুম করছে ক্যামেরার লেন্স।

চড়াই ভেঙে উঠে আসছে ঘোড়া আর ইয়াকের দল

ঘাসজমি পার হয়ে শুরু হল নিচের দিকে নামা। আবার সেই রডোডেন্ড্রনের জঙ্গল। কোকচুরাং-এর ট্রেকার্স হাট দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘন জঙ্গলের মাঝে কাঠের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। পাশ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে 'প্রেক চু।' নদী এখানে স্রোতস্বিনী। একটা ছোট কাঠের ব্রিজ। ট্রেকার্স হাটের সামনের বেঞ্চ, গোলা পাথরে (rolled boulder) হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েছি সবাই। একটু বিশ্রাম। সকাল থেকে পাড়ি দিয়েছি প্রায় ছয় কিলোমিটার। এখনও বাকি প্রায় দুই কিলোমিটার। গাইড মঙ্গল, সমানে তাড়া লাগাচ্ছে। 'জলদি চলিয়ে সাব। মৌসম খারাব হো রাহা হ্যায়।' ক্লান্ত পা আর চলতে চাইছে না। কিন্তু হিসেব মত আজ চড়াই কম ভেঙেছি। আর তো বাকি মাত্র দু কিলোমিটার।

ব্রিজ পেরিয়ে 'প্রেক চু'র ধার ধরে এগিয়ে চললাম। নদীখাত বেয়ে বয়ে আসা ছোট, বড় নানান সাইজের বোল্ডার পেরিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ। কেবল চড়াই। আবহাওয়া সত্যি খারাপ হতে শুরু করেছে। ঘন মেঘে ঢেকে গেছে চারিদিক। শুরু হল ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। ঠান্ডা বাড়ছে। ফিরতি পথের ট্রেকারের দলের সাথে দেখা। প্রায় চল্লিশজনের বড় গ্রুপ। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিচে নামছে। পোর্টারের কাঁধে চাপিয়ে দুজনকে নামিয়ে আনতে দেখলাম। ঠান্ডায় কাবু। হাইপোথার্মিয়া। আরেকজন স্ট্রেচারে, ভাঙ্গা পা। আমাদের অবস্থাও সঙ্গিন। ধোঁয়াটে কুয়াশা, বৃষ্টি, পিচ্ছিল পাথুরে রাস্তা ভুলিয়ে দিয়েছে আমাদের দিনের শুরুর আনন্দ। দৃশ্যমানতা খুবই কমে এসেছে, দশ হাত দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখা

যাচ্ছে না। শেষের এই দু' কিলোমিটার যেন শেষ হতেই চায় না। মনে হচ্ছে হেঁটে চলেছি আদি অনন্তকাল। অবশেষে প্রায়ান্ধকার ভ্যালির মধ্যে আবছা দেখা গেল থানসিং-এর ট্রেকার্স হাট। আর কিছুটা...। ক্লান্ত শরীরটা টেনে নিয়ে চললাম আজকের আস্তানার দিকে।

ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে প্ল্যান একটু চেঞ্জ করা হল। আগে ঠিক ছিল, একরাত থানসিং কাটিয়ে পরের রাত লামুনেতে কাটিয়ে সামিট করা হবে। কিন্তু লামুনেতে রাত কাটানো ঝুঁকির হয়ে যাবে। একে অসম্ভব ঠান্ডা (মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আশেপাশে), তাছাড়াও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট, সঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা। আবার থানসিং থেকে সামিট করার অর্থ, অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম। যাইহোক, দ্বিতীয়টি বেশী গ্রহণযোগ্য হল। সুতরাং রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি মিটিয়ে স্লিপিং ব্যাগের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সঁপে দিলাম। ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে তখন সবে সাতটা। শহর কলকাতা তখন হয়ত সান্ধ্য চায়ের কাপে।

১৮ নভেম্বর, ২০১৮

ষষ্ঠ দিন: থানসিং (১২,৯৪৬ ফুট/ ৩,৯৪৬ মিটার) থেকে গোয়েচা লা টপ (ভিউ পয়েন্ট ওয়ান) (১৬,২০০ ফুট/ ৪,৯৪০ মিটার)

রাত একটা থেকে হাঁটা শুরু। উত্তেজনা কিনা জানি না, চেতন-অবচেতনের দোলাচলে সময়টা কেটে গেল। সাড়ে বারোটা থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। এক কাপ চা গলাধঃকরণ করে যখন বাইরে এলাম তখন রাত প্রায় সোয়া একটা। টর্চ, হেড ল্যাম্পের কৃত্রিম আলো ছাপিয়ে সেই আদি অকৃত্তিম জ্যোৎস্না। আকাশে শুক্ল পক্ষের চাঁদ। আর গোয়েচালার পথে তখন একদল চন্দ্রাহত !

থানসিং থেকে লামুনের রাস্তায় চড়াই উতরাই বিশেষ নেই। দুপাশে খাড়া পাহাড়, ভ্যালি বরাবর আঁকাবাঁকা সরু পায়ে চলা পথ ধরে হেঁটে চললাম। গাইড মঙ্গল জানাল টেম্পারেচার মাইনাস আঠারো ডিগ্রি। চোখ মুছতে গিয়ে টের পেলাম চোখের পাতায় কুচি কুচি বরফ জমে। প্রচন্ড ঠান্ডায় আঙুল অবশ হয়ে যাচ্ছে। পাথরের আড়ালে কাগজ জ্বালিয়ে কিছুটা আগুন করে দিল মঙ্গল আর ছোটু। আগুনে হাত সেঁকে রক্ত চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হল। লামুনে পৌঁছলাম রাত তিনটে নাগাদ। আকাশে যে একসঙ্গে অতগুলো তারা দেখা যায় সেটা কি আগে জানতাম ! কি জানি ...! হয়ত না। স্নেহাশিস আর চন্দনের তুল্যমূল্য লড়াই শুরু হয়ে গেছে কে কটা তারাখসা দেখতে পেয়েছে। আমিও গোটাকতক প্রত্যক্ষ করলাম।

লামুনে পার হবার পর শুরু হল চড়াই। ডানদিকে পাহাড় থেকে নেমে বাঁদিকে নদীতে মিশেছে অজস্র নালা। জমাটবাঁধা বরফে হাঁটার বিপদ অনেকেই হয়ত জানেন। যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করে এগিয়ে চলা। সামিতি লেক ঘিরে তখন শেষ রাতের অন্ধকার। পথ চলার সুবিধার জন্য পাঁচজন করে তিন ভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে চললাম।

ভোরের আলো ফোটার মুহূর্তে সামিতি লেক

সামিতি লেক পার হওয়ার পর চড়াই আরো খাড়া। পথের এই ভাগের চ্যালেঞ্জ যেন সবচেয়ে বেশি। রাতজাগা ক্লান্ত শরীর, তিন-সাড়ে তিন ঘন্টা টানা হাঁটার পর অবসন্ন পা বনাম গোয়েচা লা টপের হাতছানি...এক তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব। অক্সিজেন লেভেল বেশ কম। হৃদযন্ত্রের গতি ক্রমশ দ্রুতগামী। দমে সাংঘাতিক টান পড়ছে। ক্লান্ত শরীর টেনে নিয়ে চলেছি লক্ষ্যের দিকে। আকাশ ততক্ষণে ফরসা হতে শুরু করেছে। রাত ও দিনের সে এক অদ্ভুত সমাপতন।

শেষ চড়াই ভেঙে ওঠার পর রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁ দিকে হিমবাহসৃষ্ট সুগভীর গিরিখাত। রাস্তা এখানে ভীষণ সঙ্কীর্ণ। বিপদসংকুল। সুন্দরও যে ভয়ঙ্কর হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সামনে পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। গোয়েচা লা টপ (ভিউপয়েন্ট ওয়ান) থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই সৌন্দর্য বর্ণনা করার ধৃষ্টতা আমার নেই। নীল আকাশের ব্যাকড্রপে দিনের প্রথম আলো এসে পড়ল পাহাড়চূড়ায়। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ তখন সত্যিই সার্থকনামা। ফেরার পর কোনো এক ব্লগে দেখেছিলাম এক অদ্ভুত ছবি...। গোয়েচা

লা টপ থেকে সূর্যোদয়ের মুহূর্তের সাক্ষী এক ট্রেকারের দু চোখে জলের ধারা। অভিব্যক্তি বাঙ্ময় হয়ে ধরা পড়েছে সে ছবিতে। সেই মুহূর্ত ভুলিয়ে দিল সব প্রতিকূলতার কথা।

কাঞ্চন বর্ণা - গোয়েচা টপ (ভিউ পয়েন্ট ওয়ান) থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

ফেরার পথে সামিতি লেকের পাশে প্যাকড ব্রেকফাস্ট খোলা হল। ফেরার বিশেষ তাড়া নেই। রাতে যখন এই পথে গেছি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাই নি। সকালের রোদে ভ্যালি জুড়ে শুধুই নানা রঙের আলপনা। নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সাদা পাহাড়। একপাশে খরস্রোতা নদী। ভ্যালি জুড়ে হলুদ আর লাল ফুল। মাঝে মাঝে সাদা শিরা উপশিরার মত পাহাড়ি নালা। লামুনে ক্যাম্পসাইটে পৌঁছালাম সকাল পৌনে দশটা নাগাদ। দেখা হল বিদেশী যুগলের সঙ্গে। গোয়েচা লা-র ছবি দেখতে চাইলেন। চা বিস্কুটের পরে বিদায় নিয়ে চললাম থানসিং-এর উদ্দেশে।

সন্ধের আগে থেকেই শুরু হয়ে গেল আড্ডা। আমাদের থেকেও খুশি মঙ্গল ও তার দলবল। হারমোনিকার সুরে তখন নেপালী লোকগীতি। একটার পর একটা অবিরাম গেয়ে চলেছে, তারপর সবাই একসঙ্গে ধরল 'রেশম ফিরিরি...।' ট্রেকিং-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিস্তব্ধ ভ্যালি জুড়ে তখন শুধুই গ্রাম্য পাহাড়ি সুর।

চন্দনের ডাকে সেই প্রবল ঠান্ডায় ট্রেকার্স হাটের বাইরে এলাম একবার। 'তুষারের রাজধানী ধুয়ে যায় জ্যোৎস্নায়।' স্নেহাশিস বলেছিল "প্রকৃতি এখানে মন্দির হলে, মাউন্ট পান্ডিম বিগ্রহ, ...আর এই কুটির যেন নাটমঞ্চ।"

ট্রেকার্স হাট, থানসিং

১৯ নভেম্বর, ২০১৮

সপ্তম দিন: থানসিং (১২,৯৪৬ ফুট/ ৩,৯৪৬ মিটার) থেকে বাখিম (৮,৬৫৪ ফুট/ ২,৬৩৮ মিটার)

এবার ফেরার পালা। ব্রেকফাস্ট করে সকাল নটা নাগাদ আবার শুরু হল পথ চলা। উতরাই। থানসিং থেকে নিচের পথ ধরলাম। আকাশে মেঘ রোদের লুকোচুরি। ফেলে আসা চেনা বাঁক, কাঠের সেতু পেরিয়ে চলা। পাশে পাইনের জঙ্গল বেয়ে নামতে শুরু করেছে কুয়াশা। দেখতে দেখতে কোকচুরাং ট্রেকার্স হাট। চকোলেট ব্রেক। আকাশে তখন মেঘ ঘনাতে শুরু করেছে। পাড়ি দিতে হবে লম্বা পথ। রডোডেনড্রনের জঙ্গল। বাঁ দিকের পথ ধরে চললাম। বৃদ্ধ মহীরুহের শিকড়, শিরা উপশিরার মধ্যে দিয়ে একফালি পায়েচলা পথ। পেঁচালো লতায় শ্যাওলার ছোপ। লেগে আছে কুচি কুচি বরফ। সাদা বরফের বুক চিরে তিরতির করে বয়ে চলেছে ঝরনা। বেলা বারোটায় সাঁঝের আঁধার। শুরু হল স্নো ফল। বরফের মধ্যে গুটিকয় Tibetan Snow Cock। বিরক্ত না করে এগিয়ে চললাম।

ফেডাং পেরোনোর পর শুরু হল ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। উতরাইয়ে নামছি বলে একটানা চলা সম্ভব হচ্ছে। সোকা পেরোনোর পর সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। টর্চ, হেডল্যাম্প জ্বেলে সার বেঁধে নামছি সবাই। ঘন অন্ধকারের মধ্যে বাখিম পৌঁছালাম। সকলেই অসম্ভব ক্লান্ত । আজ হেঁটেছি প্রায় ১৯.৬ কিলোমিটার।

২০ নভেম্বর, ২০১৮

অষ্টম দিন : বাখিম (৮,৬৫৪ ফুট/ ২,৬৩৮ মিটার) থেকে ডুবডি

আজ ট্রেকের শেষদিন। বাখিম থেকে ইয়ুকসামের বদলে যাব ডুবডি গ্রাম। বসন্ত, মঙ্গলদের গ্রাম। গ্রামে রাত কাটানোর সেই আন্তরিক নিমন্ত্রণ ফেরানোর সাধ্য আমাদের ছিল না। শুধু চলতে হবে একটু বেশি, সব মিলিয়ে প্রায় ষোল কিলোমিটারের মত।

বাখিম থেকে সেই একই পথে ফেরা। ঢালু রাস্তা বেয়ে নেমে চলা। উতরাইয়ে চলার কষ্ট তেমন নেই। মুহূর্তে পৌঁছে গেলাম সাচেন। ট্রেকার্স হাটের চায়ে গলা ভিজিয়ে আবার চলা।
একে একে 'মেন্টোগাং খোলা' (Mentogang Khola) 'সুশে খোলা' (Tshushay Khola) পার হয়ে নেমে চলেছি। গোলাপি চেরিব্লসম মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশানাল পার্কের তোরণ পেরিয়ে, 'ফা খোলা'র (Pha Khola) ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে এসে পড়লাম ইয়ুকসাম। ইয়ুকসাম পেরিয়ে এগিয়ে চললাম ডুবডির দিকে। বিকেল গড়িয়ে দিন তখন সন্ধেতে ঢলে পড়েছে। পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঁকি দিয়েছে ত্রয়োদশীর চাঁদ। মুঠোভরা জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে পাহাড়ে, জঙ্গলে। জঙ্গলের আবডালে জমাট বাঁধছে জোনাকির দল। গাছের ডাল ছুঁয়ে জ্যোৎস্না গলে পড়েছে সেই একলা পাহাড়ি পথে। কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। কোথাও একটা কষ্ট হচ্ছে। এই পাহাড়, এই জঙ্গল, এই আড্ডা এই সবকিছু ফেলে আমাকে ফিরতে হবে জয়পুর। পিছনে দূর থেকে ভেসে আসছে গলার আওয়াজ..... শুভ, বাবুকা, ডাব্বু। অন্য বাঁকে আমি হেঁটে চলেছি, একা... দূরত্ব বাড়িয়ে।

পুনশ্চ : উচ্চতাসংক্রান্ত তথ্যাবলী ইন্টারনেটসূত্রে প্রাপ্ত, ত্রুটি মার্জনীয়।

জোংরি থেকে কোকচুরাং-এর পথে

~ *জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেকরুট ম্যাপ* ~ *জোংরি-গোয়েচা লা ট্রেকের আরও ছবি* ~

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী সুদীপ্ত ঘোষ বর্তমানে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-এর জয়পুর অফিসে কর্মরত। কাজের জন্য বছরে ছয় মাস পাহাড়ে, জঙ্গলে। ফিল্ডে থাকাকালীন অবসর কাটে বই পড়ে। ক্রাইম থ্রিলার আর ভ্রমণ কাহিনি বিশেষ পছন্দ। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখাও পছন্দের তালিকায় নতুন সংযোজন। ভালো লাগে ঘুরে বেড়াতে। পাহাড় আর জঙ্গল দুইই বিশেষ প্রিয়। এছাড়া বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া অন্যতম পছন্দের কাজ। লেখালিখির হাতেখড়ি 'আমাদের ছুটি'তেই।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

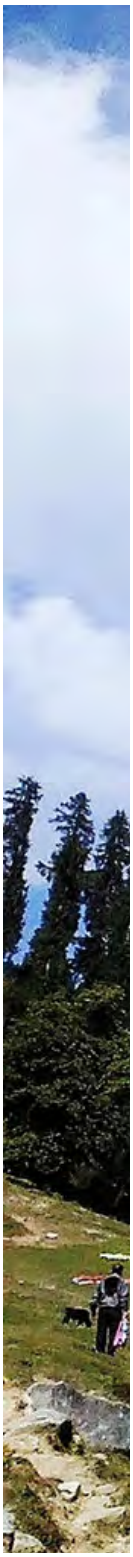

মানালির ডায়েরি

কৌস্তভ মজুমদার

~ *মানালি-রোটাং পাসের আরও ছবি* ~

৯ই অক্টোবর ২০১৬, রবিবার, কুরুক্ষেত্র, রাত ৯:২৫ মিনিটঃ

কুরুক্ষেত্র! তবে মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্র নয়, এটা হল মোটেল গোল্ডেন সারসের পাঁচতারা উঠোন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আরও দুটো বাসের পাশে আমাদের বাস দাঁড়িয়েছে। মিতা আর আমি চলেছি দিল্লি থেকে মানালি। রাজারা পরে যোগ দেবে। হোটেল চত্বরে হলুদ রঙের আলোআঁধারি। খোলা আকাশের নীচে বসবার বেঞ্চি। আশপাশ পাম গাছ আর ফোয়ারা দিয়ে সাজানো। ঝাঁ-চকচকে বিত্তবান পরিবেশ। আসলে কুরুক্ষেত্র মানেই বর্তমান আর ইতিহাস ছেড়ে মন চলে যায় একেবারে পৌরাণিক যুগে। মহাভারতের ঘটনা আমার মতে সামাজিক জ্যামিতির বৃহত্তম এবং কঠিনতম উপপাদ্য। ভাবতে অবাক লাগে, এই আদি মহাকাব্যই আমাদের দেশের যাবতীয় সভ্যতার (এবং অসভ্যতার) ভিত্তি।

আমরা এই সারস হোটেলে থেমেছি ডিনার করতে। ভাত, ডাল, ভাজি, মিক্স ভেজ খেতে দুজনের খরচা হল ছশো টাকারও বেশি। আমাদের বাস দিল্লি ছেড়েছে সন্ধে ছটা কুড়ি নাগাদ। প্রায় সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার রাস্তা যেতে সময় লাগার কথা দশ-বারো ঘণ্টা। এসি লাক্সারি কোচ। বাসের ছাদ থেকে সিট পর্যন্ত গ্লাস উইন্ডো। সব আরামকেদারার সঙ্গে রয়েছে মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট। জলের বোতলও দেওয়া হয়েছে সবার জন্য। বাসের মধ্যে একটা বাঙালি দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে এ কোণ থেকে ও কোণ কথা ছোঁড়াছুড়ি করে যাচ্ছিল। কাজেই বেশ একটা হৈচৈ ভাব নিয়ে আমরা সোনিপাত-পানিপথ-করনাল হয়ে কুরুক্ষেত্র অবধি পৌঁছেছি। অর্থাৎ শ্রীনগর-কন্যাকুমারী হাইওয়ে ধরে আমরা তিন ঘণ্টায় প্রায় ১৭৫ কিলোমিটার উত্তরে চলে এসেছি। এরপর আম্বালা হয়ে চণ্ডীগড়। সেখান থেকে বিলাসপুর, সুন্দেরনগর, মান্ডি, ভুন্টার, কুল্লু হয়ে মানালি। বিয়াসের ধার ধরে পাহাড়ি পথ। কিন্তু রাতের বেলা বাইরের দৃশ্য বিশেষ উপভোগ করার নেই। কাজেই এবারে বাসে উঠে ঘুমের একটা চেষ্টা করা দরকার।

১০ই অক্টোবর ২০১৬, সোমবার, মানালি, সকাল ১১:৩০ মিনিটঃ

মানালি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছেছি সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ।
ভোর চারটের সময় আমাদের বাস মান্ডিতে রিফ্রেশমেন্ট ব্রেক দিয়েছিল। গায়ে জ্যাকেট চাপিয়ে বাসের বাইরে পা রাখতেই পাহাড়ি ঠান্ডার ঝলক টের পেলাম। অন্ধকার ভেদ করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়। কয়েকটা হোটেল-রেস্তোঁরায় আলো জ্বলছে, আর গোটা চারেক নাইট সার্ভিসের বাস ওই রেস্তোঁরাগুলোর সামনে থেমেছে। বাসের লোকজনও ভাগাভাগি করে রেস্তোঁরাগুলোতে ঢুকেছে। কেউ কেউ দেখলাম চা-কফিরও অর্ডার দিল।
মান্ডি থেকে মানালি আরও ১০৮ কিলোমিটার।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি দিনের আলো ফুটেছে। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে ছটা, আর বাসের জানলা দিয়ে দেখলাম পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বিয়াস নদী আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। পাহাড়ের ঢালে গাছগাছড়ার ফাঁক দিয়ে কোথাও কোথাও ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক এই পাহাড়ি পথে চলার পর বাস অপেক্ষাকৃত জমজমাট দোকানপাট ঘেরা একটা জায়গায় থামল। কন্ডাকটারের হাঁকডাকে বুঝলাম মানালি এসে গেছি।

বাইরে কনকনে ঠান্ডা। বাস থেকে লাগেজ সংগ্রহ করে একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বিয়াস হোটেলের পথ দেখিয়ে দিল (এখানে কুলিও ছিল, কুড়ি টাকায় লাগেজসমেত বিয়াস হোটেলে পৌঁছে দেবে)। আমরা বাস রাস্তার উতরাই ধরে পুবদিকে সামান্য এগিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিতেই দেখলাম বিয়াস নদীর লাগোয়া হিমাচল ট্যুরিজমের হোটেল বিয়াস। বাসস্ট্যান্ড থেকে আক্ষরিক অর্থেই দু মিনিটের রাস্তা।
হোটেলের চেক-ইন বেলা বারোটায়। রিসেপসনের ভদ্রলোক বললেন দশটা নাগাদ ঘর পেয়ে যেতে পারি। রাজাদের আসতে আসতে সেই বিকেল। হোটেলের ক্লোকরুমে মালপত্র রেখে ফ্রেশ হয়ে রাস্তায় বেরলাম।

প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র বৈবস্বত মনুর মানসজাত মানালি। পুরাণের গল্প অনুযায়ী, ভগবান মনুর সপ্তম অবতার বৈবস্বত অবগাহনের সময় একটি ছোট্ট মৎস্য দেখলেন। সেই মৎস্যের নির্দেশ অনুযায়ী বৈবস্বত মনু তাকে ভক্তিভরে সংরক্ষণ এবং পালন করতে শুরু করলেন। কালক্রমে সেই মৎস্য বিশাল আকৃতি ধারণ করল এবং বৈবস্বত মনু তাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে এলেন। সেই মৎস্য সমুদ্রে যাবার পূর্বেই আসন্ন মহাপ্রলয় সম্বন্ধে বৈবস্বত মনুকে সতর্ক করে দিয়েছিল। প্রলয়কালে,সমগ্র পৃথিবী যখন জলে নিমজ্জিত,ওই মৎস্যের দৌলতে সপ্তঋষি সহ বৈবস্বত সুরক্ষিত রইলেন। এই মৎস্যই ভগবান বিষ্ণুর মৎস্য অবতার। কালের প্রবাহে প্রলয়ের সমুদ্র প্রশমিত হল। তার পরিবর্তে রইল সুবিশাল পর্বতরাজি আর নদী। এই পর্বতের কোলেই হল ভগবান মনুর নামাঙ্কিত মানালসু। "মনু-আলয়" থেকে কলিযুগের ডাকে মানালি। নদীর নাম বিয়াস। মানব জন্মের সৃষ্টিও নাকি বিয়াসের ধারে এই মানালিতে।

বিয়াস নদীর পাড়ে মানালি শহর

পৌরাণিক স্বর্গের সংজ্ঞা আমার জানা নেই,তবে এই জায়গাটা নিঃসন্দেহে স্বর্গীয়। মানালির উচ্চতা ২০৫০ মিটার। সেই পুরাণের আমল থেকেই পাহাড়ের বুক চিরে ছুটে চলেছে বিয়াস। হোটেল থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে এগোতেই বিয়াস নদীর ওপরে পর পর দুটো ব্রিজ দেখলাম। দুটো ব্রিজই ওয়ান ওয়ে। আমরা প্রথম ব্রিজটা পেরিয়ে নদীর পুব পাড়ের রাস্তায় উঠলাম। ব্রিজের দক্ষিণ দিকে আমাদের হোটেল বিয়াস। আর উত্তরে তাকিয়ে দেখলাম হিমালয়ের মাথায় বরফ পড়েছে। রাস্তার অন্য ধারে পাহাড়ের ঢালে মানালি শহর আর দেবদারু গাছের জঙ্গল। নদীর ধারের রাস্তা ধরে হাঁটাহাঁটি করে সত্যি মন ভরে গেল।

বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ মনে হল খিদে পেয়েছে। নদীর ধার ছেড়ে হোটেলের পাশ কাটিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এলাম। বাসস্ট্যান্ডে দেখলাম কয়েকটা কন্সট্রাকসানের কাজ চলছে। সবগুলোই বোধহয় হোটেলের। এখানে এই মুহূর্তে গোটা চারেক বাস দাঁড়িয়ে আছে আর মেরেকেটে জনা দশেক স্থানীয় লোক ঘোরাফেরা করছে। শহরের মধ্যে এত ফাঁকা বাসস্ট্যান্ড আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। জায়গাটা চারদিকে পাহাড় ঘেরা। সামনের পাহাড়ের গায়ে সেই সাজানো দেবদারু গাছের সারি। আর উত্তরে শহরের মাথায় বরফের মুকুট। সেই সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম দিকে উডল্যান্ড জুতোর হোর্ডিং-ও চোখে পড়ল। স্থানীয় একটা রেস্তোঁরায় রুটি-রাজমার তরকারি আর লিকার চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারলাম।

খেয়েদেয়ে আবার বিয়াস নদীর দিকে হাঁটা লাগালাম। হোটেলের কাছে এসে দেখলাম উল্টো দিকে পাহাড়ের ঢাল ধরে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফুট। সেখানে কয়েকটা দোকান উঁকিঝুঁকি মারছে। ওপরে উঠে দেখলাম জায়গাটা একটা বাজার। রাস্তার দুপাশেই আনাজপাতি, ফলমূল, জামাকাপড়, শীতের পোশাক, খাবারদাবার এমনকী গরমাগরম জিলিপিও বিক্রি হচ্ছে। এখন হবে না। বিকেলে একবার হিমাচলী জিলিপি টেস্ট করে দেখতে হবে।

দোকানগুলোতে এখনও তেমন ভিড় জমেনি। পশ্চিমদিকে আরও একটু এগোতেই দেখলাম আমাদের রাস্তাটা আড়াআড়ি (উত্তর-দক্ষিণ)বিস্তৃত একটা ঝকঝকে চত্বরে এসে মিশেছে। মোড়ের মাথায় একটা ছোট্ট, কিন্তু ভীষণ সুন্দর মন্দির। গেরুয়া মন্দিরের গায়ে কাঠের কারুকার্য। এটা দুর্গামন্দির। ঝকঝকে চত্বরের পুরোটাই রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো। এটাই মানালি ম্যাল।

মানালি ম্যাল

গতকাল সারারাত বাস জার্নি করেছি। তাই এখন আর ম্যালে না ঘুরে হোটেলের ফিরতি পথ ধরলাম। হোটেলে এসে একটু অপেক্ষা করে সোয়া দশটা নাগাদ ঘর পেয়ে গেলাম। ঘরের লাগোয়া বারান্দায় এসে দেখলাম নিচে অপরূপা বিয়াস আপনভোলা হয়ে ছুটে চলেছে।

আসলে এই দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্যই লগ হাট, কটেজ বা অন্যান্য হোটেল ছেড়ে বিয়াস হোটেলের ঘর নেওয়া। সত্যি,এখানকার বারান্দায় বসে মানালি আর বিয়াসের রূপ দেখে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়।
আপাতত চুপচাপ বিয়াসের শোভা অনুভব করি। তারপর লাঞ্চ সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যাবে।

১০ই অক্টোবর ২০১৬, সোমবার, মানালি, সন্ধ্যে ৭:৫০ মিনিটঃ

সারাদিনে যা বুঝলাম,মানালির সৌন্দর্য বড় আটপৌরে। এ আলাদা করে খুঁজতে হয় না, যেন নানা অছিলায় নিজেই বার বার সামনে হাজিরা দিয়ে যায়। আসলে এখানে দার্জিলিং, মুসৌরি, কালিম্পং-এর মত ঘিঞ্জি ভাব নেই,তাই প্রকৃতিও অনেক পরিস্ফুট। রাস্তাঘাটে যতজন লোক থাকা দরকার,যেন হিসেব করে ঠিক ততজনই পথে নেমেছে। এরা মুলতঃ হিন্দিভাষী, কিন্তু উচ্চারণে হিমাচলী নিজস্বতা আছে। স্থানীয় লোকজন (বিশেষতঃ মেয়েরা)ফর্সা এবং সুঠাম চেহারায় আর্যদের কথা মনে করিয়ে দেয়। আরও দেখলাম, ম্যাল অঞ্চল ছাড়াও বিভিন্ন দ্রষ্টব্যের আশেপাশে ছড়ানোছেটানো বাজার গড়ে উঠলেও মানালির বিকাশ ঘটেছে প্রধানতঃ বিয়াসের ধার ধরে। মোদ্দা কথা, এত সহজ সরল শান্ত প্রবাহমান সৌন্দর্য আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

লাঞ্চ সারলাম বিয়াস হোটেলের রেস্তোঁরাতেই। রেস্তোঁরাটা ছোটো। তবে বাইরের বারান্দাতেও টেবিল - চেয়ার পেতে খাবার বন্দোবস্ত রয়েছে। নিরামিষ লাঞ্চ। দাম একটু বেশি। খাবারের পরিমাণও।

খেয়ে দেয়ে বেরোতে বেরোতে বেলা দুটো বাজল। এখানকার সাইটসিয়িং বলতে পুরানো মানালির মনু মন্দির আর মানালি-কুল্লুর পথে ছয় কিলোমিটার যেতে কুল্লুর এককালীন রাজধানী জগৎসুখ যেখানে অষ্টম শতকে তৈরি পাথরের গৌরীশঙ্কর মন্দির আর পনের শতকের সন্ধ্যা গায়ত্রী মন্দির অবশ্যদ্রষ্টব্য। এখানেই নাকি অর্জুন মহাদেবের তপস্যা করে পাশুপথ অস্ত্র সংগ্রহ করেন। অনতিদূরে রয়েছে হিড়িম্বা টেম্পল, বশিষ্ঠ আশ্রম, সোলাং -রোটাং, খান তিনেক তিব্বতী মনাস্ট্রি, নাগ্গার ক্যাসল ইত্যাদি। এছাড়া নানা ইনডোর গেমসের পসরা সাজিয়ে রয়েছে ক্লাবহাউস। এর মধ্যে আগামীকাল কেলং যাবার পথে সোলাং - রোটাং দেখে নেওয়া যাবে। আর নাগ্গার ক্যাসল-এ আমাদের বুকিং আছে ১২ তারিখ। তাই আপাততঃ আমরা কাছাকাছির মধ্যে বশিষ্ঠ আশ্রমের দিকে যাওয়া স্থির করলাম।

বশিষ্ঠ আশ্রম মোটামুটি দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার পথ। বাসস্ট্যান্ডের দিকে একটু এগোতেই একটা অটো পেয়ে গেলাম। সাদাসিধে স্বাস্থ্যবান ড্রাইভার ভাড়া চাইল একশো টাকা। সারা বছর পর্যটনের ওপর ভর করেই ওর জীবিকা নির্বাহ। কাজেই দরদস্তুর করার বিশেষ ইচ্ছে হল না।

অটো ডানদিকে তিব্বতী কলোনি ছাড়িয়ে মানালি-লে সড়ক ধরে উত্তরমুখে ছুটে চলল। একসময় বাঁ দিকে বিয়াস নদী চলে এল একদম রাস্তার পাশে। ড্রাইভার বলল এখানে নাকি র‍্যাফটিং হয়। আরও একটু এগিয়ে মানালি-লে সড়ক এবং বিয়াস ছেড়ে ডান দিকে চড়াই ওঠা। দেখতে দেখতে একটা বাজার এলাকায় পৌঁছে ড্রাইভার সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, "বশিষ্ঠ আশ্রম আগে হ্যায়।"

এলাকাটা আসলে একটা পাহাড়ি মফঃস্বল অঞ্চল। রাস্তার দু পাশে ছোটোখাটো হোটেল-রেস্তোঁরা আর মূলতঃ শীতবস্ত্রের দোকান। দোকানের জিনিসপত্রের মধ্যে চোখ টানল হিমাচলী টুপি। দরাদরি করে সত্তর টাকা দিয়ে একটা কিনেও ফেললাম। আর সৌখিন পোশাক পরা দোকানদারের চাপাচাপিতে দেখলাম ছিঙ্গু কম্বল। যতদূর বুঝলাম,স্থানীয় উচ্চারণে এগুলোর নাম পেরু। দোকানদারের কথায়,ছিঙ্গু নামে এক

দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর লোমের তৈরি এই রঙচঙে কম্বল। এই দুষ্প্রাপ্য প্রাণী এবং দুষ্প্রাপ্য কম্বল দুয়েরই জন্মস্থান নাকি খোদ ভূস্বর্গ। ম্যজিক কম্বলের একদিক ঢাকা দিলে গরম,আর অন্য দিকে ঠান্ডা হয়। দাম পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দিয়ে ৭৫০০ টাকা। সঙ্গে নানান রকম ফ্রি গিফট আর 'বিফলে মূল্য ফেরত' এর টোপ। টোপ গিললে বাড়িতে মাল পৌঁছে যাবে পনেরো দিনে। এখানে প্রায় সব দোকানিরাই এই কম্বল দেখানোর জন্য ব্যস্ত। এদের সঙ্গে দু-চার কথা বলতে বলতে তিরিশ গজ এগোতেই দেখলাম বশিষ্ঠ আশ্রম।

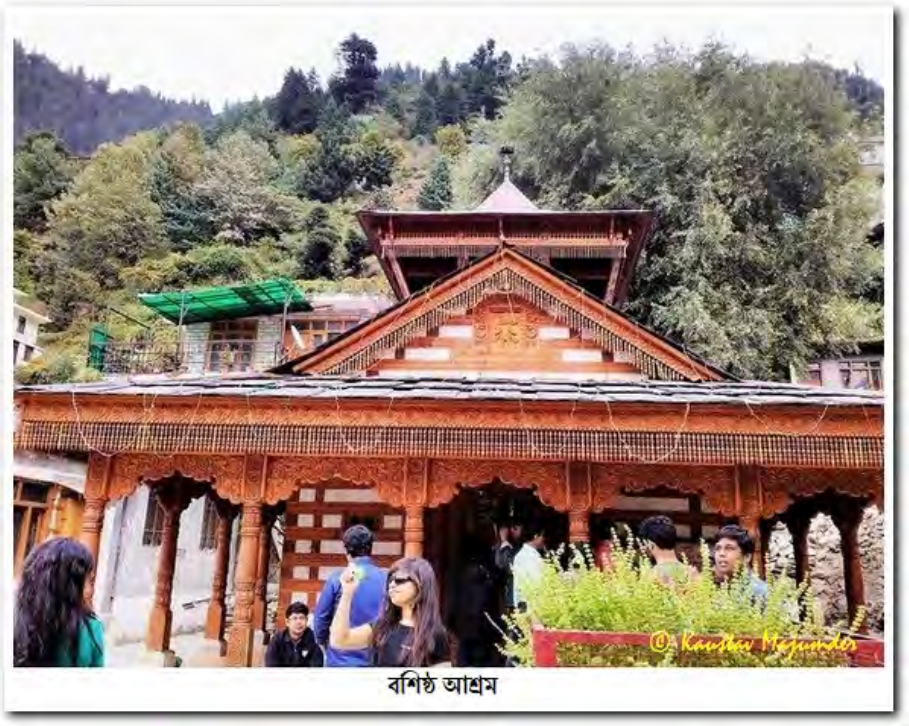

বশিষ্ঠ আশ্রম

আশ্রমের আশেপাশে গোটা দুয়েক পূজার সামগ্রী বিক্রির দোকান। এখানে তিনটি ধাপে কাঠের কারুকার্যমণ্ডিত তিনটি মন্দির আছে। রাস্তার সমতলের মন্দিরটা ছেড়ে একটু এগোলেই দু'ধাপ নিচে মূল মন্দির। মন্দিরে ঢুকে চাতাল। পূর্বদিকের মন্দিরে পূজারি রয়েছে। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণে ছেলে আর মেয়েদের স্নান করার আলাদা বন্দোবস্ত। দেখলাম অনেকেই সেখানে পুণ্যস্নানে মেতেছে। প্রস্রবণের ছবি তোলা নিষেধ। আরও দেখলাম,নব বিবাহিত দম্পতিও সদলবলে এই আশ্রমে এসেছে পুণ্য অর্জনের জন্য।

হিমাচলের কাঠের মন্দিরগুলোর একটা প্যাটার্ন আছে মনে হল। কারণ,সকালে দেখা ম্যালের দুর্গা মন্দিরের সঙ্গে বশিষ্ঠ আশ্রমের গড়নের অনেক মিল। রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ উঠে আরও একটা মন্দির। এখানেও ভালোই জনসমাগম হয়েছে। নিচে রাস্তার ধারের মন্দিরটাতে দেখলাম একদল বিদেশিনী তিলক কেটে নিজেদের ছবি তুলতে ব্যস্ত। সংস্কৃতির কী অদ্ভুত মেলবন্ধন!

বশিষ্ঠমুনি এখানে ঠিক কোথায় বসে তপস্যা করেছিলেন জানি না তবে পুরাণ-ইতিহাস-ভূগোল-দর্শনার্থী-পুণ্যার্থী-স্নানার্থী মিলে জায়গাটার স্থানমাহাত্ম্য আছে। কথিত আছে লক্ষণের বাণ ওই উষ্ণকুণ্ডের উৎস। জলে সালফার আছে। স্নানে নাকি নানান রোগের উপশম হয়।

বেলা সোয়া তিনটে নাগাদ ফিরতি পথ ধরলাম। এবারের গন্তব্য হিড়িম্বা মন্দির। সেই মতো বাজারের মধ্যে এসে অটো ধরলাম। আবার মানালি-লে সড়ক দিয়ে দক্ষিণদিকে এসে বিয়াস পেরিয়ে উত্তরপশ্চিমমুখী হিড়িম্বা টেম্পল রোড ধরে পৌঁছলাম মন্দিরের কাছে। ছয় কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে অটো ভাড়া পড়ল দুশো টাকা।

মন্দিরের সামনেটা ঘিঞ্জি দোকানপাটে ভরতি। প্রবেশপথের সামনে গোটা দুয়েক ভিখারি,কতগুলো পূজাসামগ্রীর দোকান,ছবি তোলার জন্য একটা চমরী গাই,খাঁচার মধ্যে জোড়া খরগোস,হিমাচলী পোশাক পরে ছবি তোলার ব্যবসা,ভ্রাম্যমান ছবিওয়ালা - কী নেই! মহাভারতীয় মতে,এখানেই নাকি ভীম আর হিড়িম্বার বিবাহ হয়। আর ভারতীয় ইতিহাস অনুযায়ী,১৫৫৩ সালে মহারাজা বাহাদুর সিং-এর আমলে তৈরি হয় এই সাতাশ মিটার উঁচু চারধাপের প্যাগোডাসধর্মী কাঠের মন্দির। আবার এখানেই পাষাণ বেদিতে পড়েছে ভগবান বিষ্ণুর পায়ের ছাপ। ভিতরে পিতলের দেবী মূর্তি। বাইরে দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন। মন্দির চত্বরেও ভ্রমণার্থীদের ভিড়ভাট্টা। মন্দিরের চারপাশে পাইন আর দেবদারু গাছের নিস্তব্ধ জঙ্গল। এর পুরনো নাম ঢুংরী জঙ্গল। তাই মন্দিরেরও ডাকনাম ঢুংরী মন্দির।

হিড়িম্বা মন্দির

লাইন দিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢোকার কোনও প্রশ্নই নেই। তাই মন্দিরের আশে পাশে প্রায় সাড়ে চারটে অবধি ঘোরাঘুরি করে আমরা চললাম ম্যালের দিকে। সার্কিট হাউস রোড ধরে দু কিলোমিটার গেলেই ম্যাল। এবার অটো নিল আশি টাকা। সেই সুন্দর ঝকঝকে রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো ম্যাল রোড। অনেক হোটেল-রেস্তোরাঁ-দোকান রয়েছে এখানে। এর মধ্যে উত্তর ভারতীয়,দক্ষিণী,চিনে,বিলিতি,এমনকী ভাত-ডাল-পোস্তর বাঙালি রেস্তোঁরাও আছে।

পাহাড়ঘেরা ম্যাল লোকজনে ভর্তি। চোখে পড়ল স্টেট ব্যাঙ্কের এটিএম,সকালে দেখা উডল্যান্ডের সেই শোরুম। ম্যাল রোডের মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারপাশে বসার জায়গাগুলোও সব ভর্তি। একটু এগোতেই পেয়ে গেলাম সকালের সেই দুর্গা মন্দির। মন্দির ছাড়িয়ে হিমাচল ট্যুরিজমের অফিস। তার পাশে ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশান। এক কথায়, মানালিতে এটাই সবচেয়ে জমজমাট জায়গা।

আমরা ফিরেছি ঘণ্টাখানেক হল। রাজাদের এখনও পাত্তা নাই। আগামীকাল কেলং যাব। এখানে প্রতি মঙ্গলবার মেন্টেনেন্সের জন্য রোটাং পাসের রাস্তা বন্ধ থাকে। তবে কেলং যাওয়ার কোনও বিধিনিষেধ নেই। ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশান থেকে জেনেছি আগামী কালও সকাল আটটা থেকে বেলা একটা অবধি শুধু কেলং যাত্রীদের জন্য পারমিট দেওয়া হবে । আমাদের অবশ্য পারমিট হয়ে গেছে। ভাবছি,কাল সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই বেড়িয়ে পড়ব।

১১ ই অক্টোবর ২০১৬, মঙ্গলবার, সোলাং ভ্যালি, সকাল ১০:২০ মিনিটঃ
সোলাং ভ্যালি পৌঁছতে সময় লাগল ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট।
কমল কিশোর ওর পক্ষীরাজের মত ধবধবে সাদা ইনোভা গাড়ি নিয়ে বিয়াস হোটেলে চলে এসেছিল সকাল সাড়ে আটটার আগেই। কিন্তু বাঙালির ধর্ম মেনে আমরাই বেরোতে বেরোতে নটা বাজিয়ে দিলাম। দোষ দিয়ে লাভ নেই, সাতসকালের ঠান্ডার কনকনানি আর সুন্দরী বিয়াসের মায়াজাল কাটাতে এটুকু অতিরিক্ত সময় তো বরদাস্ত করতেই হবে। প্রথমে শীত উপেক্ষা করে স্নান করার চ্যালেঞ্জ, তারপর পেটপুরে আলুর পরোটা-আচার-কফি দিয়ে বিয়াস হোটেলের বিনি পয়সার ব্রেকফাস্ট, তারপর হোটেলের বিল মিটিয়ে গাড়িতে লাগেজ ওঠানো - সময় বহিয়া যায়... । রাজাদের গাড়ি পারমিট করাতে পারেনি, কাজেই ওরাও আমাদের সঙ্গেই চলেছে এ যাত্রায়।

কিছু কিছু লোক আছে, যাদের পরিচয়ের প্ল্যাকার্ড নিয়ে বেড়াতে হয় না, কারণ প্রথম দর্শন থেকে এদের কখনও অপরিচিত বলে মনেই হয় না। আমাদের চালক কমলকিশোর অনেকটা সেই ধাঁচের। ওর বাড়ি-গাড়ি সব শিমলার। চেহারায় হিমাচলী, ব্যবহারে আন্তরিক, দিব্যি খোশ গল্প করতে করতে আমাদের নিয়ে সোলাং অবধি চলে এল। যেন কতদিনের চেনা।

মানালি থেকে সোলাং ভ্যালি তেরো কিলোমিটার। পাহাড় কেটে তৈরি মানালি-লে জাতীয় সড়ক বিয়াসের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতে খেলতে চলে গেছে উত্তর দিকে। সবুজ ফেনিল জলরাশির ওপারে পাহাড়। সেই যেখানে রাস্তা নেমেছে বিয়াসের পাশে, সেখানে আজ দেখলাম অনেক লোক। কেউ কেউ নদীতে নেমে পড়েছেন গা ভেজাতে।

বিয়াস মোটামুটি রাস্তার বাঁ দিক ধরে বয়ে চলেছে। তাকে কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনোবা যাচ্ছে না। শহর ছাড়িয়ে আরও একটু এগোতেই দৃষ্টি পড়ল নীচের দিকে এক বিস্তীর্ণ সবুজের গালিচার ওপর, যেখানে লুকিয়ে পড়া বিয়াসের পাশে কতগুলো মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং ছবির মত সাজানো। বাড়িগুলোর ছাদের গড়ন বিলিতি ঢঙে। সব বাড়ির ছাদই প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে সবুজ রং করা। দূর থেকে দেখে মনে হল এগুলো হোটেল। আসলে এটা একটা ছোট উপত্যকা, যার পর আবার পাহাড়ের প্রাচীর। সবুজ থেকে ক্রমশ শুকনো হয়ে যাওয়া পাহাড়ের মাথায় হালকা বরফের আস্তরণ। একেবারে ক্যানভাসে আঁকা।

আজ রোটাং পাস বন্ধ বলে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া নেই। একটা ভেড়ার পাল ছাড়া কোনও প্রাণীরই দেখা পাইনি সারা রাস্তায়। রাস্তার অবস্থা ভালো। হিমালয়ের বুক চিরে ঊর্ধ্বমুখী রাস্তা হলেও রাস্তায় ঘন ঘন বাঁক নেই। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। উপরি হিসাবে পাহাড়ের গায়ে-মাথায় বরফ দেখা দিতে লাগল প্রায় সমস্ত যাত্রাপথেই।

প্রায় আধঘণ্টা পরে আমাদের গাড়ি মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরল। নিস্তব্ধ রাস্তায় পাইন-দেবদারুর সঙ্গে কানাকানি করতে করতে খানিক দূর যেতেই দেখলাম এক জায়গায় কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা আছে। বুঝলাম আমরা সোলাং ভ্যালি পৌঁছে গিয়েছি।

গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম এখানে হোটেল রয়েছে, মুদিখানার দোকান রয়েছে, বড় বাগান-ছাতার নীচে ছোটো চায়ের দোকান রয়েছে, ট্যুরিস্টও রয়েছে। এখান থেকে খানিকটা চড়াই উঠে আবার একটা রাস্তা। তারপর মাঠ। তারপর পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়। যত্ন করে বরফঘষা ফিকে রঙের পাহাড়ের সামনে সেই মার্কা মারা দেবদারু-পাইনের সারি অনন্তকাল ধরে কিসের যেন প্রতীক্ষা করে চলেছে।

সোলাং ভ্যালি

মাঠের মধ্যে যত না ট্যুরিস্ট, হুড়োহুড়ি তার চেয়ে অনেক বেশি। ন্যাড়া মাঠে প্যারাগ্লাইডিং চলছে। একজন মহিলা প্যারাগ্লাইডারকে দেখলাম শূন্য থেকে প্রায় উড়ে এসে শুকনো ডাঙায় আছাড় খেল। তৎক্ষণাৎ রিটায়ার্ড হার্ট। বরফ থাকলে একরকম, কিন্তু এই শুকনো পরিবেশে প্যারাগ্লাইডিং করার দুঃসাহস দেখাতে গেলে বাদবাকি ট্যুর হরিবোল হয়ে যেতে পারে। তাই প্যারাগ্লাইডিং বাদ দিয়ে মাঠ পেরিয়ে গেলাম রোপওয়ে ষ্টেশনে। রোপওয়ে ক্যাব যাচ্ছে পাহাড়ের ওপরের দিকে। ভাড়া সাড়ে ছশো টাকা করে। টিকিট কেটে ক্যাব এ উঠে পড়লাম।

ক্যাবে মোটামুটি ছ'জন বসতে পারে। রোপওয়ের রাস্তাটায় পাহাড়ের ঢাল জুড়ে সবুজ ঘাস বোনা। মিনিট দশেকের জার্নি। এরই মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য সবুজ পাহাড়ের পিছন দিকে বরফমোড়া হিমালয় উঁকি মেরে গেল। রোপওয়ে থেকে নেমে দেখলাম সাইনবোর্ডে এখানকার উচ্চতা লেখা আছে ১১, ৮০০ ফুট।

ঠান্ডা আছে। তবে তাতে রোদ্দুরের প্রলেপও আছে। রোপওয়ে স্টেশনের পাশেই সাজানোগোছানো রেস্তোঁরা। পাহাড়ের ঢালে সেই চোখ-ভালো-করা সবুজ ঘাসের আস্তরণ। আশেপাশে নানা জাতের ছোট বড় নাম-না-জানা গাছগাছালি। একদিকে বুনো গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, দূরে, পাহাড়ের চুড়োয় কেউ যেন তুলি দিয়ে বরফের প্রলেপ এঁকে দিয়েছে।

এখানেও বাঙালির সেই চেনা হৈ-হুল্লোড়। যথারীতি সবচেয়ে বেশি ভিড় জমেছে রেস্টুরেন্টে। রোপওয়ে স্টেশন আর রেস্টুরেন্ট ঠিক পাশাপাশি। এর পিছন দিকেও, পাহাড়ের গায়ে ঠিক যেন হাতে বোনা দেবদারু গাছের সারি। তার ওপরের দিকে খয়েরি রঙের পাহাড় চুড়োয় সাদা বরফের আঁচড়। সব মিলে দুর্দান্ত ছবি। কিন্তু তবুও, এ হিমালয়কে কেমন একটু যেন অন্য রকম লাগছে।

বরফ ঢাকা হলে কেমন হত জানি না, তবে আজকের সোলাং এর সবচেয়ে আভিজাত্য ওর উচ্চতায়। অক্টোবরের পরিষ্কার আকাশে এখানে বরফের আশা করা বৃথা। তাই যা দেখলাম সেটাকে মগজবন্দি করে এই বেলা কেলং-এর দিকে রওয়ানা দিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। সামনে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দুর্গম পাহাড়ি পথ। অতএব, চরৈবেতি চরৈবেতি।

১১ ই অক্টোবর ২০১৬, মঙ্গলবার, মারহি, দুপুর ১২:৪৫ মিনিটঃ

যতই তাড়াহুড়ো করি না কেন, সোলাং ভ্যালি ছেড়ে রওয়ানা হতে হতে সেই সোয়া এগারোটা বেজে গেল। সোলাং-রোটাং প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা। তার ওপর আমরা রোটাং পেরিয়ে যাব কেলং অবধি। রাস্তার বেশ কিছু অংশ আবার শুনেছি অগোছালো ভাবে রাখা ফিতের মতো প্যাঁচালো। সুতরাং মনে মনে একটু তাড়াহুড়ো ছিলই। কিন্তু গাড়ি দু-চারটে বাঁক ঘুরতেই সমস্ত চিন্তা যেন ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে গেল।

রাস্তার দুপাশে দুর্ভেদ্য পাহাড় আর আকাশছোঁয়া সার সার দেবদারু-পাইন-বার্চ জাতীয় গাছ। গাছের পিছনে রুক্ষ পাহাড়ের ঢাল। গাছের রঙ একেবারে তরতাজা সবুজ নয়; বরং পাহাড়ের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে সামান্য ফিকে। একদম হাত মেলানোর দুরত্বে পাহাড়ের লাগোয়া বরফের

প্রাচীর। আশ্চর্য! প্রতিটা বাঁক ঘুরতেই এই বরফের পাহাড় যেন নানা রকম ভঙ্গিমায় পথের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে প্রকৃতি যেন সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে ছেলেখেলা করেছে।

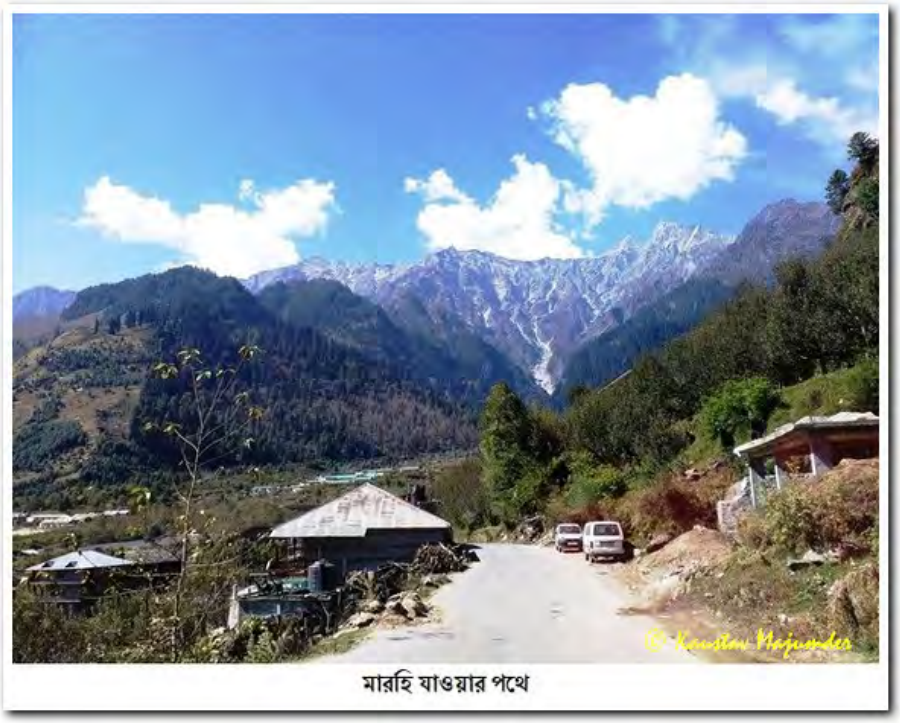

মারহি যাওয়ার পথে

বিয়াস নদী পথের দৃশ্যকে যোগ্য সঙ্গত করছে; হঠাৎ হঠাৎ কোনও বাঁক ঘুরেই মনে হচ্ছে ওই বরফের চুড়ো ভেঙে নদীটা নেমে এসে পাহাড়ি ব্রিজের নিচ দিয়ে সোজা মানালির দিকে দৌড় লাগিয়েছে। "নদী আপন বেগে পাগলপারা।" এই রকম ছবি ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। গাড়ির বাকি সকলেই নির্বাক দর্শক। একমাত্র কমলকিশোরই যা ব্যস্ত। ওর বহু পরিচিত এই সৌন্দর্য ওকে কতটা অভিভূত করছিল বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু এরই মধ্যে ও সোলাং থেকে চার কিলোমিটার এগিয়ে "Ladakh Motor India" লেখা এক গুমটি অফিসে পারমিট দেখিয়ে এল। অফিসের আশেপাশে দু-চারটে গাড়ি চোখে পড়লেও জনবসতি নেই। তবে কমল বলল, কাছাকাছি নাকি পালচান নামে একটা ছোট গ্রাম আছে। আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে কমলই চিনিয়ে দিল রহল্লা ফলস। এখন সময় কম। তাই ঠিক হল ফেরার সময় এখানে নামা হবে। তারপর বিয়াস লেকের ব্রিজ পেরিয়ে একটু যেতেই আমাদের গাড়ি একটা পাহাড় ঘেরা তেরপল রঙা উপত্যকায় ঢুকে পড়ল। কমল বলল "ইয়ে হ্যায় মারহি।"

এখানেই আপাততঃ টি ব্রেক নেওয়া হয়েছে। আমরা সোলাং ভ্যালি ছেড়ে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার চলে এসেছি। আগেই বলেছি, এলাকাটা চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। রাস্তাটা যেন উপত্যকার এক দরজা দিয়ে ঢুকে একটা বাঁক নিয়ে উল্টো দিক দিয়ে বেড়িয়ে গেছে। এখানকার উচ্চতা ৩৩৬০ মিটার। উপত্যকার প্রবেশ করেই বাঁ দিকের পাহাড়ের ঢালে গলা জড়াজড়ি করে একটা মন্দির আর একটা চোর্তেন। প্রত্যন্ত হিমালয়ের বুকে ধর্মের কোনও ভাগাভাগি নেই। আমরা পায়ে পায়ে গিয়ে দেখলাম মন্দিরের দরজা বন্ধ (স্থানীয় একজন মহিলা বললেন, এটা নাকি দুর্গা মন্দির)।

ওপর থেকে উপত্যকাটা একদম ছবির মতো দেখাচ্ছে। খয়েরি রঙের পাহাড়ি দুর্গের মাঝখান দিয়ে পাটকিলে রঙা রাস্তা। তার পাশে কতগুলো রেস্তোঁরা, গোটা পাঁচ -সাত গাড়ি, একটা টুরিস্ট বাস আর সবসুদ্ধু জনা ত্রিশেক লোক। আরেকটা বিশেষত্ব হল, এখানে একটাও গাছ নেই। এইসব নিরামিষ উপকরণ দিয়ে অদ্ভুত সৌন্দর্য তৈরি হতে পারে ভাবতেই পারছি না।

মারহি

ছবিতে দেখা লাদাখ উপত্যকার সঙ্গে এখানকার অনেক মিল। মারহি আদতে রোটাং পেরিয়ে কেলং, কাজা যাত্রীদের জন্য একটা হল্ট পয়েন্ট। এখানে যাত্রীরা খাওয়া দাওয়া সারতে নামে। বরফ পড়ে রোটাং পাস বন্ধ হলে ট্যুরিস্টরা সাধারণতঃ মারহি পর্যন্ত আসতে পারে। এখানেও প্যারাগ্লাইডিং-এর আসর বসে। তবে আজ রোটাং বন্ধ; তাই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসও বন্ধ।

আমরা রাস্তার ধারে খোলা রেস্তোঁরায় চা নিয়ে বসেছি। লিকার চা এক গ্লাস পঁচিশ টাকা। রোটাং এখান থেকে এখনও পনেরো কিলোমিটার। ঘড়ি বলছে প্রায় দুপুর একটা। কমলকিশোর বলছে "জলদি কিজিয়ে।" অতএব, মারহির মোহ এবার ত্যাগ করতেই হচ্ছে।

মারহি ছাড়াতেই নিচের দিকে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসা বিয়াস লেককে ঘিরে ফিতের মতো রাস্তাগুলো দেখা দিতে লাগল বার বার। এক এক পাক ঘুরে ওপরে উঠছি, আর বিয়াস লেক এবং তার সংলগ্ন ঘূর্ণিপাক রাস্তা এক ফ্রেম করে ছোট হচ্ছে। আগেই বলেছি এ হিমালয় কেমন যেন অপরিচিত। আমি উত্তর সিকিম দেখেছি, আবার গাড়োয়ালের হিমালয়ও দেখেছি; সেখানে পাহাড়ের গায়ে সবুজের আবরণ যেন আদিম প্রকৃতির লজ্জা নিবারণ করে তাকে আরও সুন্দরী করে তুলেছে। কিন্তু এখানকার সৌন্দর্য বড় নগ্ন আর পুরুষালি। সবুজ দূরের কথা, আশপাশের পাহাড়ে একটা ঘাসও চোখে পড়ছে না। এটা পীর পাঞ্জাল রেঞ্জ। এ আসলে যত না হিমালয় তার চেয়ে অনেক বেশি হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম। এই পথ শোভা দেখতে দেখতে অনেকটা চড়াই উঠে রাস্তার ডানদিকে দেখলাম একটা ইগলু আকৃতির আস্তানা। কমল গাড়ি থামিয়ে বলল, "হাম লোগ রোটাং পাশ আ গয়ে। উও হ্যায় বিয়াস মাতা মন্দির। আপলোগ ঘুমকে আও।"

রোটাং পাস

প্রায় ৪০০০ মিটার উচ্চতায় পৃথিবীর বুকে পা ফেলে হাঁটার রোমাঞ্চ ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। ঘড়িতে বাজে দুপুর একটা চল্লিশ। এখানে আজ আমরা ছাড়া অন্য কোনও পর্যটক নেই। রাস্তার ডান দিকের পাহাড়ে তিরিশ-চল্লিশ মিটার দূরে কতগুলো পাথুরে সিঁড়ি চড়ে বিয়াস টেম্পল। পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে পৃথিবীর শীতলতম ঝোড়ো হাওয়া কানে সপাটে ঝাপটা মারল। কোনোরকমে হাতে গ্লাভস, মাথায় জ্যাকেটের টুপি চাপিয়ে ওই মারাত্মক ঠান্ডা সামাল দিতে দিতে বিয়াস মাতার মন্দিরে পৌঁছতেই কোথা থেকে যেন একজন মিলিটারি জওয়ান আমাদের পাহারা দিতে চলে এল। ইশারায় জানাল মন্দিরের ভিতরে ঢোকা নিষেধ। মন্দিরের মাথায় হলুদ পতাকা। আশে পাশে আরও কতগুলো পতাকা প্রবল হাওয়ায় উড়ছে। এখানে এখন বরফ নেই। তবুও এই ভয়ঙ্কর পাথুরে পাহাড়ের মধ্যেও কী যেন এক অনাবিল আকর্ষণ রয়েছে, যার টানে লক্ষ লক্ষ পর্যটক প্রতিবছর এখানে ছুটে আসে।

মিনিট পনেরো পর ফটোসেশন শেষ করে নীচে নামলাম। গাড়ি সামান্য একটু এগোতেই দেখলাম রাস্তার ডানদিকে একটা চোর্তেন। রাস্তার পাশে অগভীর খাদ। তার পাশেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে সার সার পাহাড়ের চূড়ো। খয়েরি থেকে ক্রমশ নীল হয়ে যাওয়া সেইসব পাহাড়ের গায়ে-মাথায় শুভ্র বরফের প্রলেপ। আকাশে ঝকঝকে রোদ্দুর। আর এত নীল আকাশ আমাদের মতো শহুরে লোকের কাছে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। আমরা এখানেও হৈ হৈ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। গাড়ির বাইরে আসতেই আবার শুরু হল কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার ভয়ঙ্কর আক্রমণ। আবহাওয়ার যা অবস্থা, এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাই দায়। এরমধ্যেই এক হাতের গ্লাভস খুলে কোনরকমে ছবি তোলা হল।

রোটাং পাসকে আশ মিটিয়ে উপভোগ করে বেলা দুটো দশ নাগাদ আমরা গাড়ি স্টার্ট করলাম। গন্তব্য গ্রামফু পেরিয়ে আরও সাত-আট কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে কোকসার - স্পিতি উপত্যকার দক্ষিণের সদর দরজা।

কোকসার যাওয়ার পথে

~ *মানালি-রোটাং পাসের আরও ছবি* ~

কৌস্তভ মজুমদারের বেড়ে ওঠা কলকাতায়। পেশায় গার্ডেনরিচ শিপবিলডার্সের ইঞ্জিনিয়ার। ঘোরা আর পড়া দুটোই নেশা। সেই থেকেই লেখার নেশার উৎপত্তি। নিজের ফেসবুক প্রোফাইলের বাইরে 'আমাদের ছুটি'-তেই প্রথম লেখা পাঠানো।

কেমন লাগল : - select -
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

নীলাকুরিঞ্জির খোঁজে

গার্গী মন্ডল

~ *মুন্নারের আরও ছবি* ~

নীলগিরি, আক্ষরিক অর্থে নীল রঙের পাহাড়। দক্ষিণ ভারতে যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা আছে, তার কিছুটা অংশকে বলা হয় নীলগিরি। এই নীলগিরির উচ্চতম শিখরটির নাম ডোডাবেট্টা, যেটি উটি শহর থেকে মাত্র ছয় কিমি দূরে অবস্থিত। নীলগিরি পর্বতমালা উত্তর-দক্ষিণে নব্বই কিমি এবং পূর্ব-পশ্চিমে মোটামুটি আশি কিমি জুড়ে বিস্তৃত। তামিলনাড়ুতে একটি জেলার নাম নীলগিরি, যেখানে ডোডাবেট্টা অবস্থিত। এছাড়াও কর্ণাটক ও কেরালাতেও বেশ কিছুটা অংশে নীলগিরি বিস্তৃত।

কথিত আছে নীলগিরি পর্বতের নামকরণ হয়েছে এক বিশেষ ফুল থেকে। এই ফুলের নাম হল নীলাকুরিঞ্জি। অদ্ভুত সুন্দর এই বেগুনি রঙের ফুলটি বারো বছরে একবার ফোটে। বর্ষার শেষে যখন একটু একটু করে রোদ উঠতে থাকে,সেই শরতের নীল আকাশের নীচে আস্তে আস্তে ফুটতে থাকে নীলাকুরিঞ্জিরা। ক্রমে পাহাড় ঢেকে যায় এই নীলচে-বেগুনী রঙের ফুলে, দূর থেকে মনে হয় নীল পাহাড় অথবা নীলগিরি। নীলাকুরিঞ্জি ফুলের গাছটি আসলে একটি গুল্ম। পাহাড়ি রাস্তার ধারে বা পাহাড়ের ওপরে ঝোপ করে ফুটে থাকে এরা। ফুলগুলি সবচেয়ে সুন্দর দেখায় সকালবেলায়, যখন জ্বলজ্বল করতে থাকে নরম সূর্যের আলোয়।

এই বিশেষ ফুলটির সম্মানে নীলগিরির নামকরণ হলেও আজ এই ফুল অনেকাংশেই কম দেখতে পাওয়া যায়, যার মূল কারণদুটি হল বসতি গড়ে ওঠা এবং চা বাগান বানানো। দেখা গেছে চা চাষ এই ফুলের জন্য যথেষ্ট হানিকারক। সেইজন্য এখন তামিলনাড়ু, কর্ণাটক বা কেরলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর এর দেখা পাওয়া যায়না। এই ফুলটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপাতত কেরল সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেশ কিছু পাহাড়ি এলাকাকে জাতীয় উদ্যান বানিয়ে। এদের মধ্যে বিশেষ হল মুন্নারের এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান। এছাড়াও আছে কানন দেভান উদ্যান, কুরিঞ্জি স্যাংচুয়ারি, চিনার জাতীয় উদ্যান ও মারায়ূরের (মুন্নার থেকে চল্লিশ কিমি দূরে) কিছু অংশ।

খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম ২০১৮-তে এই ফুল দেখতে পাওয়ার সবচেয়ে সম্ভাবনা বেশি এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যানে। বর্ষার শুরু থেকেই এখানে যাব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম - নীলগিরি দেখতে, যে ফুল বারো বছরে একবার ফোটে তাকে চাক্ষুষ করতে। বাধ সাধল এই বছরের কেরলের ভয়ঙ্কর বন্যা যাতে মুন্নার বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিভিন্ন খবরের কাগজ ও চেনাজানা লোকেদের কাছ থেকে বারবার খোঁজ নিয়ে অবশেষে ট্রেনের টিকিট কেটেই নিলাম, কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে জেনেও। এরাভিকুলাম উদ্যানের টিকিট আর হোটেল অনলাইনে বুক করে নিলাম। তারপর, সবরকম ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে, খানিক ভগবানের উপর ভরসা করে, ২৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার যাত্রা করলাম মুন্নারের উদ্দেশ্যে - নীলাকুরিঞ্জির সন্ধানে।

ব্যাঙ্গালোর থেকে তিন-চারটি ট্রেন আছে আলুভা যাওয়ার জন্য। আমরা যাচ্ছি কন্যাকুমারী এক্সপ্রেসে। রাত আটটায় ট্রেন ছাড়ল, পরদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আলুভা স্টেশন পৌঁছল,ঘন্টা দেড়েক লেটে। স্টেশনে নেমে পুট্টু আর ডিমের তরকারি খেয়ে নিলাম। পুট্টু হল ভাত আর নারকেল দিয়ে তৈরি কেরলের একটি খাদ্য। খাওয়াদাওয়া সেরে আলুভা থেকে বাসে মুন্নারের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। মাঝে কোঠামাঙ্গলাম বলে এক জায়গায় বাস বদলাতে হল। আলুভা থেকে মুন্নারের দূরত্ব প্রায় একশো পঁচিশ কিমি, জনপ্রতি বাস ভাড়া একশো পনেরো টাকা, সময় লাগল প্রায় পাঁচ ঘন্টা। প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করেও যাওয়া যেতে পারে, খরচা পড়বে প্রায় তিন হাজার টাকা। আলুভা থেকে মুন্নারের রাস্তায় পড়বে বেশ কিছু নয়নাভিরাম জলপ্রপাত। আদিমালী (মুন্নারের ত্রিশ কিমি আগে) থেকে কিছুটা এগোলেই শুরু হয়ে যাবে চা বাগান। এই পাহাড়ি রাস্তায় চলার জন্য সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও কিছু বমির ওষুধ রাখা বাঞ্ছনীয়। মুন্নারে নানারকম বাজেটের হোটেল আছে থাকার জন্য। খাওয়ার জন্যও প্রচুর রেস্টুরেন্ট আছে, ভারতবর্ষের সবরকম খাবারই মোটামুটি পাওয়া যায়।

মুন্নারের চা বাগান

অনলাইন বুকিং ছাড়াও এরাভিকুলাম উদ্যানের জন্য মুন্নারের কে.এস.আর.টি.সি. বাসস্ট্যান্ডের সামনে অফিস থেকে টিকিট পাওয়া যায়। আমাদের তিনজনের জন্য একটি স্টিলক্যামেরা ব্যবহারের অনুমতিসহ অনলাইনে খরচ পড়েছিল চারশো টাকা। টিকিট কাটার সময় উদ্যানে প্রবেশের সময় পছন্দমত বাছাই করার সুযোগ আছে। উদ্যান খোলা থাকে সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি,এর মধ্যে যতক্ষণ খুশি এখানে সময় কাটাতে পারা যায়। গেটে টিকিট দেখালে উদ্যানেরই বাসে আপনাকে আপনার টাইম স্লট অনুযায়ী মূল উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই মূল উদ্যান থেকেও আবার বাস আছে গেটে ফিরিয়ে আনার জন্য। মুন্নার টাউন থেকে এরাভিকুলাম যাওয়ার জন্য সরকারি বাস আছে। মারায়ূর অভিমুখী বাসে চেপেও পৌঁছতে পারেন। অটো, জিপ তো আছেই। মুন্নার থেকে দূরত্ব চৌদ্দ কিমি।

এরাভিকুলাম ন্যাশনাল পার্কে ফুটেছে নীলাকুরীঞ্জি ফুল

টিকিটে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ে উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে গেলাম। এরপর ওদের বাসে করে যাত্রা করলাম অজানা সেই নীলাকুরিঞ্জির উদ্দেশ্যে। বাসে করে যেতে যেতে সবুজ চা বাগানে আবৃত মুন্নারের সৌন্দর্য উপলব্ধি করলাম। চা বাগানের ঢাল বেয়ে বাস চলল পাহাড়ের আঁকেবাঁকে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল রাস্তার দুইধারে ফুটে রয়েছে এক ধরণের বেগুনি রঙের ছোট ছোট ফুল। মাঝারি মাপের ঝোপের মধ্যে থোকা থোকা হয়ে ফুটে আছে এই ফুল। মনে সন্দেহ হচ্ছিল - এই কি নীলাকুরিঞ্জি! হঠাৎ পাশ থেকে এক সহযাত্রী তাঁর বাচ্চাকে বলে উঠলেন - এটাই নীলাকুরিঞ্জি। শোনার পর আরও একাগ্র নজরে দেখতে লাগলাম ফুলগুলিকে। দুইরকম ফুল দেখা গেল। দেখতে দেখতে বাস পৌঁছে গেল তার নির্দিষ্ট স্টপেজে। সেখানে নেমে প্রায় এক কিমি হাঁটা পথ। এই পথ বানানো হয়েছে পাহাড়ের মধ্য দিয়েই, এঁকেবেঁকে। পথের দুধারে পাহাড়ের ঢাল, তারই মধ্যে ফুটে রয়েছে থোক-থোক নীলাকুরিঞ্জি। এরই মধ্যে নানা রকম অজানা পাখির কিচির মিচিরও ভেসে আসছিল। এরাভিকুলাম উদ্যান নীলগিরি টাহর (Tahr) নামে এক লুপ্তপ্রায় পাহাড়ি ছাগলের জন্যেও বিখ্যাত। পড়ন্ত বিকেলে বহুল জনসমাগম হওয়ায় কোন বিশেষ পাখি বা নীলগিরি টাহর চোখে পড়লনা।

এরাভিকুলামে পরদিন সকালেও বুকিং ছিল আমাদের। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা উদ্যানে হাজির হয়েছিলাম। সকালের সূর্যের নরম মিঠে আলোয় চাক্ষুষ করলাম নীলাকুরিঞ্জির অদ্ভুত রূপ। সূর্যস্নাত ফুলগুলি চারিদিকে মনে হল ছড়িয়ে আছে বেগুনি মখমলের মত। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে এখনও পাহাড় জুড়ে সমস্ত ফুল ফোটেনি। মনে মনে কল্পনা করলাম নীলগিরির সেই অভাবনীয় সৌন্দর্য,যখন সে পুরোটায় ঢাকা পড়বে বেগুনি

গালিচায় আর ভোরের সূর্যচ্ছটায় জ্বলজ্বল করবে সদ্যস্নাত কিশোরীর মত। এই সময়টায় লোকজন একটু কম থাকায় দেখতে পেলাম কিছু নতুন ধরনের পাখি,যেমন নীলগিরি থ্রাশ ও নীলগিরি ফ্লাইক্যাচার। দূরে চোখ যেতেই দেখলাম একটা পাথুরে টিলার ওপর পাঁচ-ছ'টি নীলগিরি টাহর রয়েছে - কেউ শুয়ে, কেউ বসে,কেউবা দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ বাদে একটি টাহরকে খুব কাছ থেকে দেখা গেল,সে বোধহয় কোনভাবে দলছুট হয়ে লোকজনের মধ্যে এসে পড়েছে। প্রচণ্ড লাজুক এই প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আপাতত এই এরাভিকুলামেই বর্তমান। উদ্যানের গার্ডদের কাছে জানা গেল যে এখানে নীলাকুরিঞ্জির অনেক রকম প্রজাতি আছে। নীলাকুরিঞ্জি ট্রেকিং বলে একটি প্যাকেজে এদের মধ্যে অনেক প্রজাতির দর্শন মেলে। আমাদেরকে ওঁরা তিন রকম প্রজাতি দেখালেন। অবাক হলাম,একটি প্রজাতি সাদা রঙের,তার মধ্যে নীলের ছিটেফোঁটাও নেই।

নীলগিরি তাহর্

দুপুরে ফেরার পালা। এগারোটা নাগাদ ফিরতি পথে বাস ধরলাম। মুন্নারে ফিরে এসে লাঞ্চ করে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে। যা যা দেখলাম,তার মধ্যে মাটুপেট্টি ড্যাম আর একটি চা ফ্যাকট্রি। ব্রিজের উপর থেকেই দেখলাম ড্যামের সৌন্দর্য। এখানে বোটিং ও ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবস্থা আছে। চা ফ্যাকট্রিটিতে নানারকম চায়ের আস্বাদন করার সুবিধা আছে। এছাড়াও চা তৈরি করার সমগ্র প্রক্রিয়াটি খুব সাবলীল ভাবে বোঝানো হয়। চায়ের সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা যায়, যেমন গ্রীন টি ও হোয়াইট টি কাকে বলে, তাদের প্রক্রিয়াকরণ ও উপকারিতা। এছাড়াও গাড়ির ড্রাইভার আমাদেরকে একটি ফুলের বাগান আর বেশকিছু ভিউপয়েন্ট এবং একটি এলিফ্যান্ট রাইডেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

মাটুপেট্টি ড্যাম

সবকিছু শেষে বিকেল চারটে নাগাদ আলুভার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, তখন শুরু হল আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি। দেখলাম বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির এক ভয়াল রূপ। মনে পড়ে গেল কয়েক দিন আগের মুন্নারের বন্যাকবলিত রূপ। যাইহোক, আলুভা পৌঁছে গেলাম ঠিকমতই। ডিনার করে ব্যাঙ্গালোরগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আমাদের ছোট্ট এই মুন্নার সফরের কথা ভাবতে লাগলাম। মনের গভীরে কোথাও সারাজীবনের জন্য হয়তো একটা ছবি আঁকা হয়ে গেল - ঘন সবুজ চা বাগানের ঢালে উজ্জ্বল নীলাভ শাড়ি পরিহিতা এক স্নিগ্ধ মোহময়ী - নীলগিরি।

মোহময়ী নীলগিরি

~ *মুন্নারের আরও ছবি* ~

পেশায় সাইকিয়াট্রিস্ট ডঃ গার্গী মণ্ডল বর্তমানে বাঙ্গালোরের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোলজিক্যাল সায়েন্সেস (NIMHANS)-এ কর্মরত। নেশা দেশভ্রমণ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

চতুর্থ কেদার - রুদ্রনাথ

সুমন্ত মিশ্র

~ রুদ্রনাথের আরও ছবি ~

একঘর অন্ধকারে যখন জোনাকি জ্বলে - সে যেন এক মস্ত বড় আলোর নিশান! গাছেদের পাতায় চোঁয়া সবুজ আলো - যেন ঘরের কালোয় রঙমশালের ফুলকি! দুন এক্সপ্রেসের টিকিটটাও ছিল অমনি এক আলোর নিশান, আমার 'না' এর অন্ধকারে অমনই রঙমশালের ফুলকি! যাব'না'-ই ঠিক ছিল! সেদিনটায় কেমন সব ওলটপালট হয়ে গেল! মায়ের ওপর একরাশ অভিমান নিয়ে অফিস এসে যখন নিজের কম্পিউটারটায় বসলাম, অভিমানে বারবার মন বলছিল, 'থাকব না, পুজোয় কিছুতেই থাকব না বাড়িতে!' সে তো হল, কিন্তু যাব কোন চুলোয়! আজ সেপ্টেম্বরের আট তারিখ, আর সপ্তাহ তিনেক পরেই তো মহালয়া, আমার জন্য কে আর ট্রেনের বার্থ রেখে অপেক্ষা করছে! এদিকে পকেটেরও তো ঠনঠনে অবস্থা! গতবার সাগর থেকে ফিরেছিলাম রুদ্রনাথ যাওয়ার সাধ অপূর্ণ রেখে! ভেবে দেখলাম কম রেস্তোয় একমাত্র সেই সাধই পূর্ণ হতে পারে - যদি এযাত্রায় চতুর্থ কেদার সহায় হন! রেল-এর সাইট দেখাল, মহালয়ার রাতে কিছু 'বার্থ' খালি আছে।-তা নাহয় হল, কিন্তু ফেরার? আছে, তাও আছে - নবমীর রাতে মাত্র একটা বার্থই খালি আছে, উপাসনা এক্সপ্রেস-এ! টিকিট হল, ফোন করলাম সাগরের সোনু পেয়িং গেস্টহাউসের গোবিন্দজিকে, হয়ে গেল থাকার ব্যবস্থাও! 'প্রাণে খুশির তুফান' তুলে মাত্র এক ঘন্টাতেই সেরে ফেলা হল রুদ্রনাথ দর্শনের প্রস্তুতি।

মহালয়ার রাতে স্যাক্ কাঁধে যখন ট্রেনে চড়লাম, সহযাত্রীরা গভীর ঘুমে ডুবে। নিজের নির্ধারিত বার্থ খুঁজে নিয়ে সে ডুব দিতে আমারও বেশি সময় লাগল না। ঘুম ভাঙল চারদিকের ক্যাঁচর-ম্যাঁচর শব্দে। ট্রেন দাঁড়িয়ে, হকারদের ব্যস্ত যাতায়াত, জানলা গলে ঢুকে আসা নরম রোদ্দুর - সব ছেড়ে চোখ পড়ল সাইড বার্থে মুখোমুখি বসা দুটো পুঁচকের দিকে। ছোট্ট মুখে যেন খুশি উপচে পড়ছে - মনে হল এ যেন সক্কাল সক্কাল দেবদর্শন! 'গুড মর্নিং', বলে ভাব জমালাম! জানলাম ওরা মাসতুতো ভাইবোন, দাদু-দিদাকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর ছুটিতে কুমায়ুন বেড়াতে যাচ্ছে! একজন থাকে জামসেদপুর, অন্যজন কল্যাণী। আগে জানতাম 'মানুষ' নামক দ্বিপদ জন্তু বড় হতে হতে মনুষত্বে জারিত হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে! নিজের বয়স যত বেড়েছে একথার অসারতা ততই বেশি করে উপলব্ধি করেছি! আজ মনে হয় মানুষের মনুষত্বের যেটুকু অবশেষ, তা থাকে তার ওই ক্ষুদে চেহারাতেই! বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুরও অবলুপ্তি ঘটে, তখন সে পরিপূর্ণ দুপেয়ে জন্তু! যাক্ সে কথা, ওদের সঙ্গে হাসি-মজায় বেশ কেটেছিল সারাটা দিন! লখনউ আসতে ওরা নেমে গেছিল! যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের হাত নাড়ার ছবিটা ভালোবাসায় ধুইয়ে দেয় আজও! আরও এক রাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোরবেলায় পৌঁছেছিলাম হরিদ্বার। এখান থেকে গন্তব্য গোপেশ্বর, সেখান থেকে সাগর।

হরিদ্বারে স্টেশন লাগোয়া বাসস্ট্যান্ড, সেখান থেকে গোপেশ্বরের বাস ছাড়ল সাড়ে সাতটায়! প্রায় ২৩৫ কিমি পথ, সময় লাগে সাত থেকে সাড়ে সাত ঘন্টা! ভাবলে অবাক হই, সমতলে যে আমি তিন ঘন্টা বাসজার্নিতেই হাঁপিয়ে উঠি, পাহাড়ে বারো ঘন্টা জার্নিতেও তার এতটুকু ক্লান্তি আসে না কেন! চারপাশে নীল-সবুজের ছায়া, পান্নাসবুজ নদীর স্রোত, পথ উজিয়ে বয়ে যাওয়া অবিরাম ঝরনাধারা সব কেমন দেহ-মন জুড়িয়ে দেয়! এমনকি ভেড়ার পালের পথ অবরোধ - ভালো লাগে তাও! হৃষিকেশ, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, কর্ণপ্রয়াগ, চামোলি হয়ে গোপেশ্বর পৌঁছলাম যখন সময় প্রায় তিনটে ছুঁই ছুঁই! গোপেশ্বর রুদ্রনাথের শীতকালীন আবাস, কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে পটবদ্ধ হবার পর ছ'মাস এখানেই পূজিত হন দেব। প্রায় ৪,৬০০ ফুট উচ্চতায় চামোলি জেলার সবচেয়ে বড় শহর এবং প্রশাসনিক সদর দফতর এই গোপেশ্বর। মাত্র গতবছরই ঘুরে যাওয়ায় ঠিক কোথায় নামলে সাগর যাবার গাড়ি পাওয়া যাবে জানাই ছিল। সেইমত নেমে খোঁজ করি জিপের। স্ট্যান্ড তখন একেবারে ফাঁকা, খানিক সময় লাগবে বুঝে কিছু উদরস্থ করতে উদ্যত হই। স্ট্যান্ডের পাশেই একটা দোকানে জুটে যায় ডিম-টোস্ট। ইতিমধ্যেই গোবিন্দজি একবার ফোন করে খবর নিয়েছেন। আমার অবস্থান জানিয়ে ওঁকে আশ্বস্তও করেছি। আনমনে রাস্তার মানুষজন দেখতে দেখতেই 'মন্ডল' যাওয়ার গাড়ি চলে আসে! জিপের মাথায় স্যাক চাপিয়ে সামনের একটা সিটে বসি! গোপেশ্বর থেকে সাগর কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের রাস্তা, দুরত্ব ১০ কিমি। গতবার এটুকু পথই ছিল রোমাঞ্চ ঠাসা, রকমারি মাতালের রঙ্গময় মূর্তি! সত্যিই, এতবছর ধরে পাহাড়ে আসছি ভরদুপুরে এমন দৃশ্য আমার চোখে পড়েনি কখনও! মনে আছে মুজতবা আলীর 'চাচা' বলেছিলেন -"শিখের বাচ্চা, রক্তে তার তিনপুরুষ ধরে আগুন মার্কা ধেনো।" হলফ করে বলতে পারি, শিখের রক্তে যদি তিনপুরুষের ধেনো হয়, এই পাহাড়িগুলোর রক্তে তবে চোদ্দপুরুষের! প্রায় আধঘন্টা অপেক্ষার পর দশজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে জিপ ছাড়ল। গোপেশ্বর পেরোতেই এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! কখনও বমি তো কখনও কারও জিনিস পড়ে যাওয়া, সঙ্গে মহিলাদের গণ জায়গাবদল! - সবকিছু সয়ে প্রায় পাঁচটা নাগাদ নামলাম গোবিন্দ সিং নেগির হোটেলের সামনে। দুহাত বাড়িয়ে রাস্তাতেই স্বাগত জানালেন উনি। সঙ্গে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন আমার বরাদ্দ ঘর।

এখানে বেলা বড়, তাই 'ফ্রেশ' হয়ে বাইরে বেরিয়েও দেখি চারদিকে ফটফটে আলো! ঘরের বাইরে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকি

রুদ্রনাথের পথে! সেখানে তখন ঘন মেঘের ঘনঘটা! গতবার কল্পেশ্বর গিয়ে কালগোট-ডুমক-তালি-পানার হয়ে যে পথ রুদ্রনাথ গেছে, সে পথ ধরেই যাবার ইচ্ছে ছিল। দেবগ্রাম থেকে রুদ্রনাথের সেই পথ ৩৪ কিমি। আর এবারের পথ সাগর থেকে পুঙ্গ বুগিয়াল-লিটি বুগিয়াল-পানার-পিতৃধার-ধলাবনি ময়দান হয়ে - ২১ কিমি। আবার অনেকে মণ্ডল থেকে অনুসূয়াদেবী-হংস বুগিয়াল-নাওলা পাস হয়ে রুদ্রনাথ যান, নেমে আসেন সাগর হয়ে। মন্ডল থেকে রুদ্রনাথের সে পথ ২০ কিমি, ওই পথই সবচেয়ে জনপ্রিয়!

"খানা খায়েঙ্গে?", নেগি সাহেবের কথায় ভাবনার স্রোত থামে! মোবাইলে দেখি সবে সাড়ে সাতটা। জানাই, একটু পরে হলে ভালো হয়। সম্মতি দিয়ে বলেন, "সুবাহ জলদি নিকালনা পড়েগা, ইস্ লিয়ে জলদি খানা খাকে শো যানা-ই আচ্ছা হ্যায়, হর্ রোজ দো পহর কে বাদ মৌসম খারাব হো রেহে হ্যায়!" ওঁকে বলি, - কাল এখানেই থাকছি, তাই একটু দেরি হলেও অসুবিধা নেই। খুশি হয়ে ওঁর সঙ্গেই রাতের খাবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে চলে যান। সাগর-এ গোবিন্দজির মত এমন আপাদমস্তক ভদ্রলোক বিরল! আদপে এখানে থাকার জায়গা দুটি, এক এই 'সোনু পেয়িং গেস্টহাউস' অন্যটি 'হরিয়ালি লজ।' গতবার এসে প্রথম হরিয়ালি লজেই নেমেছিলাম। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে গাছ-গাছালি ছাওয়া সবুজ বাড়িটি প্রথম দর্শনে ভাল লাগলেও, কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েই বুঝেছিলাম ওটা আসলে গ্রামের মদ্যপদের আড্ডাখানা! সে জায়গায় গোবিন্দজির এই গেস্টহাউস প্রকৃত অর্থেই অতিথিশালা! গতবারের একরাত্রির উষ্ণ আতিথেয়তাই এবারও ফিরিয়ে এনেছে আমাকে। সে রাতে ভাবিজির বানান কাঁচা রাজমার ডাল আর বেগুনের তরকারি দিয়ে রুটি খেয়ে যখন শুতে গেলাম মোবাইল জানাল সবে রাত নটা!

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল বাইরের ঝমঝম শব্দে, বৃষ্টি নেমেছে। আজ কোনোই তাড়া নেই, তাই 'রেজাই' মুড়ি দিয়ে আবার পাশ ফিরে শোওয়া। এবার ঘুম ভাঙে সাতটায়। ভালো করে কান পাতি - না, কোনো বৃষ্টির আওয়াজ শোনা যায়না! দরজা খুলে বাইরে আসি, বৃষ্টি ভেজা সাগর তখনও বেশ জুবুথুবু! আকাশে টুকরো টুকরো কালো মেঘ, তবে তা মনের কোথাও আশঙ্কার মেঘ ছেয়ে ফেলার মত নয়! আজ চারপাশটা ঘুরেফিরে দেখব। ইচ্ছে আছে রুদ্রনাথের পথে কিছুটা এগিয়ে দেখে আসারও। তাই সময় নষ্ট না করে তৈরি হয়ে নিই। সকালের জলখাবার সেরে নটাতেই নেমে আসি সাগরের পথে।

সাগর-এর পথে

হোটেলের পাশ দিয়ে ধাপে ধাপে কংক্রিটের পথ, উঠে গেছে রুদ্রনাথের দিকে। মিনিট পনেরো চলতেই শেষ হয় গ্রামের বাড়ি-ঘর। পথ এবার ক্ষেতের মাঝ দিয়ে। বেশ চড়াই, হাঁপ ধরছে, মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিই। চারদিক সবুজে সবুজ, কোথাও কোথাও পাকা শস্যের হলুদ ছাপ, বৃষ্টিধোয়া সকালে সত্যিই বলতে ইচ্ছে করছে, 'আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।' চলতে চলতেই সঙ্গী জুটে যায়। "সাব দেখো, নিচে, বাঁয়া তরফ, উ, উ নিচে।" ঘাড় ঘুরিয়ে দূরে তাকিয়ে দেখি, -ভোরাল-এর মত লাগে। ওঁকে জিজ্ঞেস করি, ওগুলো কী? বলেন, "হামলোগ বোলতে কাক্ষর, আপলোগ সায়েদ হিরণ বোলতে!" সকাল সকাল এতটা আশা করিনি, আবার গাইতে ইচ্ছে হল - 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে।' সঙ্গীর নাম গজেন্দ্র সিং, সাগর থেকে ২ কিমি উঠে চন্দাকোটি - পথিকদের প্রথম বিশ্রাম ছাউনি - তার লাগোয়া চায়ের দোকান চালান ইনি। ওঁর সঙ্গে দোকান অবধি এসে এগিয়ে যাই আরও কিছুটা ওপরে। চন্দাকোটির পর রাস্তা বাঁক নিয়ে ঘুরে যায়, অদৃশ্য হয় সাগর, শুরু হয় বড় বড় গাছে ছাওয়া জঙ্গুলে পথ। আরও এক কিমি এগিয়ে আবার নেমে আসি। গজেন্দ্র সিং-এর হাতে 'মিঠি চায়' খেয়ে ফিরে আসি সাগর।

'কাঙ্খর' বা পাহাড়ি হরিণ

আচ্ছা পাহাড়ের বুকে একটা জায়গার নাম 'সাগর' কেন? প্রশ্নটা করেছিলাম গোবিন্দজিকে। উত্তরে যা বললেন সেটা বেশ চমকপ্রদ! এই গোপেশ্বর অঞ্চলই ছিল সগর রাজের রাজধানী। সগর হলেন ভগীরথ-এর পূর্বপুরুষ! সগর পৌত্র অংশুমানের ছেলে দিলীপ, তাঁর পুত্র ভগীরথ। সগর রাজ যে চণ্ডীমন্দিরে পূজো দিতেন সেটাও নাকি এই গ্রামেই অবস্থিত! তাই সগর রাজের নামেই এজায়গার নাম সাগর। আমরা এপার বাংলার লোক। ভগীরথের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অন্তহীন! গঙ্গার পবিত্র জলধারা কোন কৌশলে তিনি এখাতে বইয়ে ছিলেন ভাবলে আজও হতবাক হতে হয়! কাহিনি শুনে বেরিয়ে পড়ি চণ্ডীমন্দির দর্শনে। বাসরাস্তা থেকে আধ কিমি টানা নেমে গিয়ে চণ্ডী মন্দির। আজকের মন্দির নেহাতই নব্য, প্রাচীনের একটুকরো অবশেষও আজ নেই! গড়পড়তা পাড়ার দেবী মন্দিরের ধাঁচেই আজকের এই মন্দির। কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে এক ঘন্টাতেই ফিরে আসি গেস্টহাউস। গোবিন্দজীর দোকানে আড্ডা চলে বিকেলভর, বিকিকিনির ফাঁকেই জেনে নিই রুদ্রনাথ পথের খুঁটিনাটি। পাহাড়ের মাথার পিছে সূয্যি অস্ত যেতেই এপারের ঢালে ঢালে সন্ধে নামে। মশাদের গুনগুনানির রেশ নিয়ে উঠেপড়ি আড্ডা ছেড়ে। কাল সাগর ছেড়ে ওপরে ওঠার পালা। তাই স্যাক্ গুছিয়ে, ফোন চার্জে রেখে যখন বাইরে আসি সন্ধ্যের কালো ডানায় তখন ঘন মেঘের গুঁতোগুঁতি, পাহাড়ের ঝুঁটি জুড়ে বিদ্যুতের ঝিলিক, শরীর জুড়ে গুরুগুরু কাঁপন! মুহূর্তেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে, আমি ঠাঁই নিই খোলা জানলার পাশে, মোবাইলে বাজিয়ে দিই, "সঘন গহন রাত্রি.....!"

চন্ডী মন্দির

ঘুম ভাঙে চণ্ডীমন্দিরের শিবস্তোত্র পাঠে। দরজা খুলে পা রাখি জল-থইথই চাতালে, পাহাড়ে অন্ধকার তখন আলোর পরশ পেতে উন্মুখ। মাথা তুলে শুধু তারাদের খুঁজি, দু-একখানের সঙ্গে চোখ টেপাটেপি করে ঢুকে আসি ঘরে। বেশ কিছু জিনিস এখানে রেখে ওপরে যাব, সেগুলো ভালো করে গুছিয়ে রেখে নিজের ন্যাপস্যাকটা আরও একদফা 'চেক্' করে নিয়ে প্রস্তুতি সারি। সকাল ছটায় ভাবিজী যখন চা নিয়ে আসেন, আমি তখন রীতিমত তৈরি! চায়ে চুমক দিতেই বাইরে বেশ একটা হৈচৈ কানে আসে! ওপরের চাতাল থেকে রাস্তায় ঝুঁকে কী ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করি! কিছুক্ষণ অনুধাবন করে বুঝি কোনোকিছু চুরি গিয়েছে। গোবিন্দজী কাছাকাছি আসতেই খবর নিয়ে জানি - মন্দিরপথের তোরণের

ঘন্টা চুরি গেছে - নবরাত্রির মধ্যে এমন একটা ঘটনা এঁদের কাছে অশুভ ঠেকছে! আমার কেন জানি মনে পড়ে যায় বহুব্যবহৃত একটা বাংলা কথা, -"ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।" শুধু এক্ষেত্রে নয় যখনই কোনো কিছুতে ভক্তদের একসঙ্গে দুঃখ পেতে দেখি, আমার এই কথাটাই কেন জানি মনে পড়ে! কোথাও যেন রাজনৈতিক দলের অনুগামীদের সাথে ভক্তের স্লোগানের একটা মিল খুঁজে পাই! দুই-ই কেমন অন্তঃসারশূন্য ঠেকে! এক্ষেত্রে অবশ্য অতটা বলা যায় না! উৎসবের দিনে ঘন্টা চোরের যে আর্থিক কিছু 'মঙ্গল' হবেই এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না! ভাবিজীর বানানো রুটি-সব্জি দিয়ে 'নাস্তা' সেরে রুদ্রনাথের পথে যখন পা পড়ল, মোবাইল জানাল সকাল আটটা।

গজেন্দ্র সিং এর দোকানে

রাতভেজা সাগর-এ আজ হইহই করা রোদ্দুর! গাছেদের পাতায় পাতায় প্রাণের নেচে ওঠার আনন্দ, পাখিদের বাসায় নতুন করে জেগে ওঠার গান! পাহাড়ে আজ আলোর আলোতে চারদিক আলোকময়! আধঘন্টা একটানা চলে উঠে আসি চন্দাকোটি। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি কেউ একজন উঠে আসছেন, সঙ্গী পাওয়া যাবে মনে করে অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিই, গজেন্দ্রকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ছবি তোলায় ব্যস্ত হই। চায়ের কাপে শেষ চুমুক পড়তেই উঠে আসেন অচেনা আগন্তুক। পরিচয় সারি, নেহাতই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবক, বাড়ি দিল্লি, ইনিও যাবেন রুদ্রনাথ, তবে আজই, সেখান থেকে কাল নেমে যাবেন অনুসূয়া-মন্ডলের পথে। আমার আজ পানার পর্য্যন্তই যাওয়া - সেখান থেকে কাল রুদ্রনাথ দর্শন। ওঁর তাড়া থাকায় আর কালক্ষেপ না করে এগিয়ে যাই জঙ্গুলে পথে। প্রায় পৌনে দশটা নাগাদ পৌঁছই এক বিস্তীর্ণ সবুজে। এ সবুজ মন ভালো করে, এ সবুজ ক্লান্তি ঝরায়, এ সবুজ আপন করে থামতে বলে - পৌঁছেছি এ পথের প্রথম বুগিয়াল 'পুঙ্গ বুগিয়াল।'। কিন্তু থামার যে জো নেই! সঙ্গীর তাড়া, তাই হুমহুমিয়ে এগিয়ে চলা।

পুঙ্গ বুগিয়াল

পুঙ্গ বুগিয়ালের পর এবারের পথ ঘন অরণ্যে। বিশালাকার গাছেদের অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ার আগে ঘাড় উঁচিয়ে দেখে নিই মেঘের চাদর ঢাকা পানার-এর মুণ্ডুখানা। ঢুকে পড়ি গভীর অরণ্যে, শুরুতেই পাহাড়ি ঝরনার ওপর কাঠের পুল পেরিয়ে শুরু হয় নির্মম চড়াই। আধঘন্টা হাঁটতেই সঙ্গীর চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়ি, পাখির শিস্ আর ঝিঁঝিঁর ডাকে আধো-আঁধারি রাস্তা তখন আরও রোমাঞ্চকর! মাঝে মাঝে পেরিয়ে আসি গাছেদের জাপটে জড়িয়ে থাকা কুয়াশার ধোঁয়াশা, নিভৃত পথ যেন সত্যিই ছুঁয়ে আছে পরমেশ্বরের আপন জগৎ! তবু আমি তো নেহাতই ইহলোকের একলা পথিক! তাই পথ চলতে হাঁফ ধরে, ঘেমেও যাই সপসপে, মনে উৎকণ্ঠা থাকে - 'কতদূর এলাম'! আজব এক পথে চলেছি, এতবড় অরণ্য ঘেরা পথে কোথাও একটা পথ নির্দেশ চোখে পড়ে না! কতটা চললাম, আর কতটা চলেই বা সামনের 'পড়াও' কিছুই বোঝার উপায় নেই! মোবাইল জানাচ্ছে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। হিসেবমত এতক্ষণে 'মুলি খড়ক' পৌঁছে যাবার কথা, কিন্তু না, ধারেকাছে পৌঁছেছি কিনা তাও ঠাহর হচ্ছে না! মনকে বোঝাই জীবনে কোনো হিসেবই যখন মেলেনি তখন এটা মেলাতেই বা এত উদগ্রীব কেন!

হঠাৎ কানে আসে কাক ডাকার শব্দ, পাহাড়ে এর সাঙ্কেতিক অর্থ - কাছেপিঠে লোকালয়ের উপস্থিতি। আরও কয়েক মিনিট চলতেই দেখা মেলে একটা চালা ঘরের, অনুমান করি, এই তবে মুলি খড়ক! এগিয়ে যাই, ঘরের মধ্যে দুটো অংশ - একদিকে বিশ্রামের জন্য ঢালা বিছানা পাতা, তারই এককোণে থরেথরে রেজাই আর কম্বলের স্তুপ, অন্যদিকে উনুনের গনগনে আঁচ, সেখানে খাবার বন্দোবস্ত। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতরে চোদ্দ-পনের বছরের একটি ছেলে হাসিমুখে বলে উঠল, নমস্তে সাব, আও, চায় পিয়োগে? আর তখনই হল সর্বনাশ, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসতে গিয়েই বুঝলাম পাগুলো টেনে (cramp)ধরছে। কোনোরকমে বুড়ো আঙুল চিপে ধরে সোজা করলাম, ব্যাগের বোতল বার করে ওকে বললাম, ভর্তি করে জল দে। সেই জলে গ্লুকোজ আর নুন মিশিয়ে গলায় ঢাললাম, শেষ হলে আরও একদফা। তারপর ওকে বললাম, জাদা মিঠা ডালকে চায় বানা, উও ভি বড়ি গেলাস মে! সব খেয়ে মিনিট পনেরো পর আস্তে আস্তে নিজের পায়ে দাঁড়ালাম! শুরু করলাম ওখানে দাঁড়িয়েই জগিং, চলল মিনিট দশ। বুঝলাম সামলে নিয়েছি! পাহাড়ে এরকম 'ক্র্যাম্প' এর আগে কখনও হয়নি! একেতো পুরোটাই চড়াই তার ওপর গোটা রাস্তায় কোথাও জলের চিহ্ন মাত্র নেই। একদিকে সারাটা রাস্তা ঘেমেছি, অন্যদিকে তৃষ্ণার্ত হয়েই হেঁটেছি, তাই এই অবস্থা। যাক্, স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে 'ছোটু'র সাথে গল্প জুড়ি - ছোটু ওর দাদুর সঙ্গে এই অতিথিশালা চালায়, দাদু এখন ভেড়ার পাল নিয়ে বেরিয়েছেন, তাই এখন একাহাতে ওকেই সব সামলাতে হচ্ছে।

স্মিত মুখে ছোটু

আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, ছোটুকে জিজ্ঞেস করি, লিটি বুগিয়াল এখান থেকে কতদুর, পানার পৌঁছতেই বা কত সময় লাগবে? ও হেসে বলে, "জাদা সে জাদা এক্ ঘন্টা লাগেগা, আপ আরাম আরাম সে চলে যাও, পৌঁছ্ যাওগে।" ওকে বলি, দেখ বাবা ঠিক বলছিস তো, আমার শরীর কিন্তু ঠিক নেই! ও আবারও হেসে বলে, "আপ আগর চাহো তো আজ রুদ্রনাথ ভি যা সকতে হো।" পাহাড়ে মানুষের এই সরলতা আজও আমায় মুগ্ধ করে! ও ইচ্ছে করলেই আমায় ভয় খাওয়াতে পারত, সেক্ষেত্রে ওর কিছু আর্থিক লাভ তো হতই! সে রাস্তায় না হেঁটে ও বরং আমায় সাহস জুগিয়েছে আবারও পথ চলার। হাঁটা দিলাম, উচ্চতা বাড়ছে, স্বাভাবিক নিয়মেই বড় বড় গাছের বদলে শুরু হয়েছে ছোট ছোট ভুজগাছে ছাওয়া পথ। দামাল মেঘের দল মজা করে ছুঁয়ে যাচ্ছে বাঁদর টুপির ঝুঁটি, অল্প হেঁটেই চলে আসি 'লিটি বুগিয়াল' - পাহাড়ের ঢালে একখন্ড সবুজ খোলা প্রান্তর। এখানেও একখানা অতিথিশালা, ভেতর থেকে ডাক আসে চা খেয়ে যাবার। ফেরার পথে খেয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এগিয়ে চলি। একটুখানি এগিয়েই শুরু হয় পাকদন্ডি, পাহাড় মুখ ঢাকে ঘন সাদা কুয়াশায়, হারিয়ে যায় আগে-পিছের পথ, শুরু হয় সাবুদানার মতো বরফ পড়া। এ একপ্রকার ভালোই, লক্ষ্য দেখা দিলেই পৌঁছনোর আকুতি থাকে, এখন সে সবের বালাই নেই, শুধুই পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা। আরও মিনিট কুড়ি চলেই পৌঁছে যাই ছবির মত সুন্দর এক মস্ত বুগিয়াল - পানার। শ্যামলবরণ পানার তখন মেঘ মুড়ি দিয়ে জুবুথুবু। শীতল অভ্যর্থনা নিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে যাই ভান্ডারি অতিথিশালার দিকে।

পানার

পিঠের স্যাক্ বাইরে রেখে, জুতো খুলে সোজা ঢুকে পড়ি রান্নাঘরে। "আও দাদা, হিঁয়া বৈঠ", - বলে উনুনের ধারে পাতা কম্বলে বসতে বলে 'প্রকাশ।' প্রকাশ ভান্ডারি - আপাতত এই অতিথিশালা চালানোর দায়িত্বে। উনুনের লাল আঁচে মুখ রাঙিয়ে হাত সেঁকতে থাকি। খিদে পেয়েছে, ওকে 'ম্যাগি' বানানোর কথা বলি, কিন্তু পোড়া কপাল, - একজন যাত্রী নাকি কিছুক্ষণ আগে ওর শেষ ম্যাগির প্যাকেটখানিও উদরস্থ করে গেছে। বাংলার এক সংবাদমাধ্যমে থেকে থেকেই ঘোষিত হয় 'এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে' বাণী। এই এগিয়ে থাকার রহস্য আজকের ভুখা পেটে কিছুটা উন্মোচিত হয়! বেশ বুঝতে পারি আগের যাত্রীটি ছিলেন আমার ওই ক্ষণিকের সহযাত্রী, এগিয়ে থাকার সুফল উনিই উদরিকরণ করেছেন। শেষমেশ খিচুড়ির ফরমায়েশ করে ঘামে ভেজা কাপড় পাল্টে, ঢাকামুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি। প্রকাশের ডাকে যখন ঘুম ভাঙে তখন বেলা তিনটে। খিচুড়ি আর পাঁপড় ভাজা দিয়ে দুপুরের খাবার সেরে আশপাশ একটু ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়ি। দেখব কী, তখনও আদিগন্ত চাপ চাপ কুয়াশার জোব্বামোড়া পানার। রুদ্রনাথের রাস্তা যে রিজ্ ধরে এগিয়ে গেছে সে পথেই ঘুরে আসি কিছুক্ষণ, উল্টো দিকে যে পথ নেমে গেছে কল্পেশ্বরের কোলে, সে পথও দেখে আসি এগিয়ে। পড়ন্ত বেলায় চুপটি করে উঠে বসি প্রকাণ্ড এক বোল্ডারের মাথায় - রহস্যে মোড়া পানারকে দুচোখ ভরে দেখি।

প্রকাশের অতিথিশালার দুটো ভাগ - একটা ইট-সিমেন্টের পাকা দেওয়াল ওপরে টিনের চালা। অন্যটা মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা। দুটো অংশেই দু'খানা করে ঘর। কাঁচাঘরে একটা রান্নাঘর অপরটায় শোবার ব্যবস্থা, পেছন দিকে একখণ্ড গোয়ালঘর। পাকা ঘরের দুটোতেই শোবার ব্যবস্থা -যাত্রীদের জন্য সাধারণত ওই পাকা ঘর দুটোরই ব্যবস্থা থাকে। 'পায়ে পায়ে হিমালয়' বইয়ের লেখক শ্রীযুক্ত অমিয় রায়ের কাছে শুনেছি ওই পাকা অংশটা নাকি ব্রিটিশদের বানানো। আকাশপথে শত্রুশক্তির গতিবিধি লক্ষ্য রাখবার জন্য এখানে সেনা মোতায়েন থাকত। ওই বই পড়েই জানা, এই ঘরের আশেপাশে রাত্রির অন্ধকারে ভৌতিক গতিবিধির কথা! শিবঠাকুরের দেশে তাঁর চেলা-চামুণ্ডাদের সঙ্গেও এই প্রথম সাক্ষাৎ হবে ভেবে মনে বেশ একটা সুপ্ত উত্তেজনা আছেই। "চায় বন্ গ্যায়া দাদা, আ যাও" - কুয়াশার ওড়না দোলানো প্রকাশের চিৎকারে উঠে পড়ি। এগিয়ে যেতে নজরে আসে ছায়াছায়া পথ ধরে দুজনের দ্রুত নেমে আসার দৃশ্য। প্রকাশের কাছে নেওয়া চায়ের গেলাস আর ভুট্টাপোড়া হাতে দাঁড়িয়ে থাকি রান্নাঘরের দাওয়ায়, তাকিয়েই থাকি যুগলের নেমে আসার পথে। সন্ধ্যে নামছে, কুয়াশাও যেন আরও রহস্যময়ী হয়ে উঠছে, কনকনে ঠান্ডায় জড়োসড়ো হয়েও এই নিভৃত প্রকৃতিকে বলতে ইচ্ছে করে, "অতল কালো স্নেহের মাঝে/ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।"

সন্ধের মুখে বেশ কিছু যাত্রী চলে আসায় সে রাতে আমার ঠাঁই হয়েছিল রান্নাঘর লাগোয়া ঘরে। আর হ্যাঁ, সারারাত ভুত-প্রেতের গতিবিধি টের না পেলেও মেঠো ইঁদুর আর প্রকাশের কিছু 'বিশেষ' অতিথির কল্যাণে 'ঘুম' নামক শব্দের সঙ্গেও সখ্যতা হলনা রাতভোর! পাহাড়ে অন্ধকার থাকতেই বিছানা ছাড়ার অভ্যেস, সেইমত সাড়ে চারটেতেই ক্যামেরা হাতে বাইরে এলাম। নিকষ কালো আকাশ তখন ঝলমলে কবিতা - "কেবল তারা। কেবল তারা।/শেষের শিরে মাণিক পারা,/হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি/কেবল তারা যেথায় চাহি।" অবর্ণনীয় সে দৃশ্য! সারারাতের নিদ্রাহীন দুচোখ তখন খুশিতে ডগমগ! পানারের নিস্তব্ধতায় কান পেতে চরে বেড়াই আপন খেয়ালে। ধীরে ধীরে পূব আকাশে রঙ ধরে, ফিরে যায় চঞ্চল ভোরালের পাল, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি পশ্চিম থেকে উত্তরের দেওয়ালে। অপেক্ষা শুধু শুভ্রপটের সেজে ওঠার। একে একে রঙ মাখে চৌখাম্বা থেকে ত্রিশুল, নন্দাদেবী থেকে নন্দাকোট। মনের কোনে উঁকি মারে প্রিয় 'কালকূট'-এর ক'টা কথা -"দুঃখ জীবনের সমগ্রতায় অনতিক্রমণীয়। সুখ থাকে দুঃখের কুন্ডলীতে। নাম তার ঝলকিত দ্যুতি। সামান্য জীবনকালের কয়েকটি স্বপ্নময় মুহূর্ত মাত্র।" এই সেই 'মুহূর্ত', আর এর খোঁজেই বারে বারে ছুটে আসা। মাথা নিচু করে বলতে ইচ্ছে হয়, -'সার্থক জনম আমার!'

সকালের সাজুগুজু সেরে, ছাতুর সরবত গলায় ঢেলে যখন বেরোনোর তোড়জোড় করছি প্রকাশ এসে একটা অনুরোধ করে আমায়। তার গোয়াল থেকেই রোজ রুদ্রনাথের পুজোর দুধ পৌঁছয় মন্দিরে। আজ সেই বরাদ্দ দু'সের দুধ নিয়ে যেতে হবে আমাকে! প্রকাশকে বলি - এ তোমার অনুরোধ নয় ভাই, এ আমার কাছে আশীর্বাদ! ওর কাছেই জানি, পথে পড়বে এ পথের সবচেয়ে উঁচু জায়গা পিতৃধার, সেখানে পূর্বপুরুষদের শান্তিকামনায় পুজো দিলে তা নাকি গৃহীত হয়, আত্মা শান্তিলাভ করে। শুধু পূর্বপুরুষ নয়, জীবনের পথে যাঁদের হারিয়েছি. স্মৃতির পটে আজও তাঁদের উপস্থিতি উজ্জ্বল, হঠাৎ হারিয়ে ফেলা সেইসব আপনজনের শান্তি কামনায় কিছু করলে নিজেরই যে ভালো লাগে! অতএব পিতৃধারে পূজো দেওয়ার জিনিসও সঙ্গে নিয়ে হাঁটা 'জয় রুদ্রনাথ' বলে - সবে সকাল সাড়ে সাতটা।

আজও একা একাই পথচলা। পানারে যাঁরা গতরাত কাটিয়েছেন তাঁরা আজ কেউ যাবেন সাগর, কেউবা আসবেন এই পথেই। যাঁরা রুদ্রনাথ

আসবেন, তাঁদের রাত্রিবাসও ওখানেই। আমারই শুধু দর্শন শেষে এখানে ফিরে আসা। অগত্যা জলদি বেরিয়ে পড়া। বরফঢাকা চূড়াদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ঢিমে তালে এগিয়ে চলা। ঘন নীল আকাশের নিচে ঢেউ খেলানো পৃথিবীর বুকে এলিয়ে থাকা বেণীর মত পথ। তাই ধরে আধঘন্টা যেতে না যেতেই পেছনে অদৃশ্য হয় পানার - ডানদিকে খাড়া পাথরের দেওয়াল আর বাঁদিকে অতল খাদ, এরই মাঝে আঁকাবাঁকা পথ ধরে হাঁটা পিতৃধারের দিকে। দেড় ঘন্টাতেই পৌঁছই পিতৃধার।

. পিতৃধার

পাথর সাজিয়ে তৈরি করা তোরণ, তাতে ঝোলানো ঘন্টা, পেরোতে হয় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। একপাশে পাথরঘেরা একখণ্ড দেবস্থান - এখন দাঁড়াব না, তাই তরতর করে নেমে এগিয়ে যাই পঞ্চগঙ্গার দিকে। এবার পুরোটা পথই উৎরাই, তিনদিক খোলা পাহাড়ের ঢাল - সামনে চৌখাম্বা, ডানদিকে ত্রিশূল, দুনাগিরি - বেশ লাগছে। সূর্য পেছনে, প্রজাপতির মত রোদ কখনও পিঠে বসছে আবার উড়ে যাচ্ছে, নীল আকাশে এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে শরতের সাদা মেঘের দল। দেখতে দেখতেই পেরিয়ে যাই পঞ্চগঙ্গা - পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনাধারা অবহেলায় কুলকুলিয়ে নেমে যাচ্ছে নদীর স্রোতের সন্ধানে। পঞ্চগঙ্গা পেরিয়েই ঢুকে যেতে হয় হাজারো গাছগাছালির অন্দরে। পরে জেনেছি এই গাছপালা নানারকম ভেষজ ওষুধের জন্য প্রসিদ্ধ। গাছে ছাওয়া পথই হঠাৎ করে একেবারে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে যায়, দেখা মেলে দেবালয়ের। পাহাড়ি পথ, এখানে লক্ষ্য পিছলে-পিছিয়ে চলে! যেই ভাবি এই বুঝি পৌঁছে গেলাম, ওমনি পথ একটু দুলুনি নিয়ে উঠেনেমে পিছিয়ে যায়। প্রায় পৌনে তিনঘন্টা একনাগাড়ে হেঁটে পৌঁছই আমার অভীষ্টে - চতুর্থ কেদার, রুদ্রনাথ। যেখান থেকে পথ ধাপে ধাপে উঠে গেছে মন্দিরের দিকে তার ডানদিকেই এক যাত্রীনিবাস। বাঁ দিকে পরপর পূজারীদের থাকার জায়গা ও মন্দিরের অতিথিশালা।

রুদ্রনাথ মন্দির

বাইরে একজন দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করেই পৌঁছই প্রধান পুরোহিতের ঘরের সামনে, - স্যাক থেকে দুধের জার বার করে ওনার হাতে দিই। আমায় জিজ্ঞেস করেন, "পূজা চড়ানা হ্যায়?" বলি - না, শুধু দর্শন করব। হাতে চাবির গোছা নিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে যান মন্দিরের দিকে, আমি অনুসরণ করি। মন্দিরের দরজা খোলা হয়, দর্শন সারি। মায়ের জন্য একটু ফুল নিয়ে পূজারীকে কিছু দক্ষিণা এগিয়ে দিই। খুশি মুখে বলেন, "পরসাদি লেনা হ্যায় তো আ যাইয়ে মেরা রুমকে পাস।" একটু পরে আসছি জানিয়ে বসে পড়ি মন্দিরের চাতালে। মূল মন্দিরে উঠে আসার আগে বাঁদিকে পরপর ছোট ছোট মন্দিরের সারি, তারা যেন পাহাড়ের গায়ের ভেতরই গাঁথা! সবকটাই শিব মন্দির, ফুসা ঘাস ঝালর হয়ে ঝুলে আছে মন্দিরের মাথায় মাথায়। ছোট্ট চাতালের ওপর মূল মন্দির কিছুটা স্বতন্ত্র, তবে তার লাগোয়াই বনদেবতার মন্দির। চারদিক দেখতে দেখতেই কখন হারিয়ে ফেলি নিজেকে। নিস্তব্ধ চরাচরে আমার অবস্থা তখন - "পলক নাহি নয়নে, হেরিনা কিছু ভুবনে/নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে।" কতক্ষণ ওভাবে বসেছিলাম খেয়াল নেই, সম্বিত ফিরল হেলিকপ্টারের বিকট আওয়াজে - উত্তরাখণ্ডের নতুন উৎপাত এটি। রাজার রাজস্বলোভ যেমন টাইগার হিলে রিসর্ট তৈরি করে, ওই একই লোভে ছাড়পত্র মেলে আকাশপথে পঞ্চকেদার দর্শনেরও! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! হোক না মৃত্যু, লাগুক না মৃত্যু মিছিল - সে সাধারণের বইতো নয়! মিছিলই যে রাজার বিনোদন, তাই উন্নয়ণের নামে এই অসভ্যতা চলছে, চলবেও!

পূজারীজির কাছে প্রসাদ নিয়ে যখন ফেরার পথ ধরি, মন ভারাক্রান্ত। সাত-পাঁচ ভাবনায় মন বিক্ষিপ্তও, তবু ফিরে চলা। পঞ্চগঙ্গার ঢালেই দেখা হয়ে যায় গতরাতের পরিচিত যাত্রীদের সঙ্গে, সামান্য কিছু কথা, আবার এগিয়ে যাওয়া স্ব-স্ব গন্তব্যে। পিতৃধারে পৌঁছে প্রিয়জন স্মরণ, মন্ত্রহীন পূজার্চনা। বড় ভালো লাগে, প্রিয়জনের আাত্মা শান্তি পেল কিনা জানিনা, আমার আত্মা শান্তি পায়। দূরের দুধসাদা পাহাড়ের কোলে তখন ধূমায়িত মেঘের ভীড়, যেন সেখানেও ধূপ-ধুনোর আরতি চলছে। প্রায় আড়াইটা নাগাদ পৌঁছই পানারে। দুপুরের খাবার সাজিয়ে প্রকাশ তখন আমার অপেক্ষায়।

রুদ্রনাথ থেকে পানারের পথ

সে রাতে ঠাঁই হল পাকা ঘরের একটাতে। ১৬ কিমি হাঁটার ধকলে শুয়েও পড়লাম সাত তাড়াতাড়ি। একঘুমে সকাল - ভুতের নাচন দেখা তো দূরঅস্ত, সামান্য আলাপচারিতার সৌজন্যটুকু থেকেও কেন বঞ্চিত থেকে গেলাম তা তাঁদের প্রভু দেবাদিদেব-ই জানেন! দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েও মন খারাপ করা দৃশ্য - চারপাশ কুয়াশাচ্ছন্ন। পানারের সবুজ আঁচল জুড়ে ঘোলাটে কুয়াশার বাড়াবাড়ি রকমের দাপাদাপি। কিছুটা হতাশ হয়েই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, তাই চা খেয়েই রওনা সাগরের পথে। অল্প নেমেই লিটি বুগিয়াল - যাওয়ার পথে দেওয়া প্রতিশ্রুতিমত হাজির হই কিষাণ সিং-এর অতিথিশালায়। চায়ের গেলাস হাতে গল্প জমে কিষাণের সাথে। গতকাল থেকেই যেটা মাথায় ঘুরছে সেটা জিজ্ঞেস করি ওকে, আচ্ছা এই যে এত পুণ্যার্থী আসেন তোমাদের কাছে, তাঁদের প্রয়োজনের জন্য তোমরা কোনো শৌচালয়ের ব্যাবস্থা করনি কেন? -পুরুষরা যদিও বা চালিয়ে নেয়, মহিলাদের সম্মানের কথাটা তোমাদের মনে হয়না? ও অসহায় ভাবে বলে, "বন বিভাগ নে ইধার তানাশাহি চালাতে হ্যায় দাদা, এক ভি কিলে ঠোকনেকে লিয়ে উনকি পারমিশন লেনা পড়তা!" একই কথা কাল প্রকাশের কাছেও শুনেছি, অবাক লাগে! যে পথে তীর্থযাত্রীদের আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, সেই পথেই তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনকেও অবজ্ঞা করছি! এর জন্য বোধহয় শুধুই দেশের দোহাই দেওয়া যায়না! অমরনাথের পথেই যে শয়ে শয়ে বায়ো-টয়লেটের ব্যাবস্থা দেখে এসেছি, তাহলে এখানে কিসের অসুবিধা! কিষাণকে বলি, ডি এম সাহেবকে বলনি কেন? এখন তো সরকার নিজের নিজের জেলায় শৌচালয় স্থাপনের জন্য ওনাদের পুরস্কৃত করছেন! ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, "আজ ডি এম সাব উপর আ রেহে হ্যায়, রাস্তেমেই আপসে ভেট হোগা, আপহি হামারে লিয়ে বোল্-দেনা দাদা!" ওকে আশ্বস্ত করে বিদায় নিই। অল্প যেতে না যেতেই চলে আসে ছোটুর দোকান। "আ গ্যয়া দাদা, চায় পিয়োগে?" - ছোটুর গলা। অনুচ্চারে বলি - তোকে না বলার সাধ্য যে আমার নেই! ঘাড় নেড়ে জানাই, - হ্যাঁ। চা বানানোর ফাঁকেই স্যাকের বোতল বার করে জল ভরে দেয় ছোটু। ফেরার সময় ওকে জড়িয়ে ধরে বলি - আবার এলে তোর কাছে একরাত কাটিয়ে যাব বেটা। চেনা পথ, তায় উৎরাই - তরতরিয়ে এগিয়ে চলি। পুঙ্গ বুগিয়ালে এসে দেখি লোকে লোকারণ্য, বুগিয়ালের সবুজ গালিচায় রঙবেরঙের মানুষের মেলা, কেউ খচ্চরের পিঠে কেউবা পায়ে হেঁটে। ভালো লাগে, ছোটু, কিষাণজী, প্রকাশ সবাই তো ওই জনমানবশূন্য প্রান্তরে বসে থাকে এদেরই প্রতীক্ষায়। সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে এগিয়ে যাই ওঁদের উল্টো পথে। সাগর পৌঁছই যখন, সবে সাড়ে দশটা।

পরদিন দুপুরে অনুসূয়াদেবী মন্দির ঘুরে আসি, সাগরের রাস্তায় তখন মানুষের ছোট ছো জটলা। খোঁজ নিয়ে জানি, ডি.এম. সাহেব রুদ্রনাথ থেকে ফিরবেন, তাই সবাই অপেক্ষারত। আমারও কিছু কথা বলার আছে, তাই তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে ওনার অপেক্ষায় থাকি। এর মধ্যেই গোবিন্দজির সৌজন্যে অনেকে জেনেছেন আমি ডি.এম. সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই, অনেকেই আমার কাছে আসছেন আর নিজেদের

সমস্যা বলছেন। ওঁদের অনুরোধ, আমি যেন কথাগুলো সাহেবের সামনে তুলে ধরি! ওঁদের বোঝাই নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই বলতে হয়, অন্যদের দিয়ে বলানো অসৌজন্য। দেখতে দেখতে প্রায় পড়ন্ত বিকেলে ডি.এম সাহেব আসেন। নেগিজির দোকানের সামনেই চেয়ার পেতে অভ্যর্থনা জানান হয়। ওঁর পাশেই একটা চেয়ার আমার জন্যও বরাদ্দ হল। আলাপপর্বের পরেই উনি জানতে চান আমি কি বলতে চাই। ওঁকে অনুরোধ করি আগে স্থানীয়দের কথা শুনুন, পরে আমি বলব। সেইমত কথা এগোয়, লক্ষ্য করি গ্রামের বেশীরভাগ মানুষের কথাই উনি তাচ্ছিল্যে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তখন ওঁকে বলি, সুমন সাহেব (ততক্ষণে ওঁর নাম জেনেছি,- বিনোদ কুমার সুমন, ডি.এম, চামোলি) সত্যজিৎ রায়ের নাম শুনেছেন? বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন - হাঁ হাঁ। বলি, ওঁর একটা গল্প বলি শুনুন। চিত্রশিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ওপর একটা ডকুমেন্টরি করবার সময় শিল্পী সত্যজিৎ-কে এই কথাগুলো বলেছিলেন - "আমার মনে হয় অনেক জিনিস শিল্পী বা সমালোচকদের চেয়ে সাধারণ লোক তাদের সহজ বুদ্ধিতে বোঝে বেশি। আগে শান্তিনিকেতনে যখন আমরা বাইরে বসে ছবিটবি আঁকতুম, তখন সাঁওতালরা এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। একবার মনে আছে, একপাল মোষের ছবি এঁকেছি। কতগুলো সাঁওতাল মেয়ে এসেছে, তাদের একজন ছবিটা দেখে বলল - এতগুলো কেড়া(মোষ) দিলি, আর একটা বাচ্চা দিলি নাই? এই একটা কথায় ছবিটার একটা মস্ত ভুল ও ধরিয়ে দিল!" - সাহেব, এই গল্পটা আমি আপনাকে শোনালাম এঁদের জন্য, আপনি এঁদের কথাগুলো একটু ভালো করে শুনুন, দেখবেন অনেক কথাই ওঁরা ঠিক বলছে। অবাক হয়ে দেখলাম উনি আবার ধৈর্যসহকারে সবার কথা শুনলেন। সবশেষে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "বোলিয়ে দাদা আপকে লিয়ে ম্যায় ক্যায়া কর সকতা হুঁ।" আমি রুদ্রনাথের পথের সমস্যাগুলো ওঁকে এক এক করে বলি। বলি - রাস্তায় মাইলফলক বসানোর কথা, জঙ্গলের রাস্তায় পানীয় জলের ব্যবস্থার কথা, অতিথিশালায় শৌচালয়ের কথা। সব শুনে বলেন, "হাম আপনি আঁখো সে সবকুছ দেখকে আয়া, আজই আট লাখ রুপিয়া স্যাংশান কিয়া হুঁ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারকে লিয়ে। বাকি সারা কাম ভি হো জায়েগা ছে মাহিনে কি অন্দর। ম্যায় আপকো রিকোয়েস্ট কর রাহা হুঁ আগলে সাল ফির আনেকে লিয়ে।" বাকি সবাইও হই হই করে বলে ওঠেন - হাঁ সাব আ যাইয়ে ফির আগলে সাল। ওঁদের আন্তরিকতা মন ছুঁয়ে যায়, মুচকি হেসে জানাই, চেষ্টা করব।

পাহাড়ে আসি, তীর্থে ঘুরি, তবু মনে মনে এই কথাটাই জানি -'সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি / সেই তো আমার তুমি ।।'

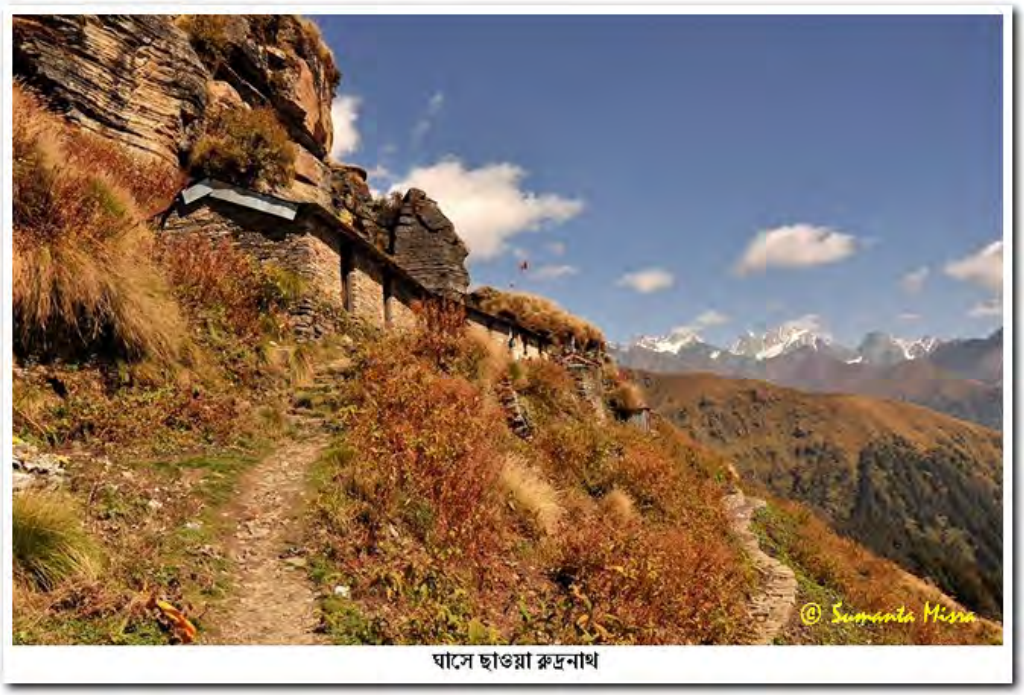

ঘাসে ছাওয়া রুদ্রনাথ

~ *রুদ্রনাথের আরও ছবি* ~

সুমন্ত মিশ্র 'হরফ' নামে একটি প্রিপ্রেস ইউনিট চালান। হিমালয়ের আতিথ্যগ্রহণ ও ফুটবল খেলার দৃষ্টিসুখ অসীম তৃপ্তি দেয় তাঁকে। ভালোবাসেন রবিঠাকুরের গান শুনতে, প্রবন্ধ পড়তে, ছোটগাছকে বড় করতে, বেড়াতে আর নানারকমের মানুষের সহচর্য পেতে! ইন্টারনেটের দুনিয়ায় 'আমাদের ছুটি' কিছু সমমনস্ক মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়ায় আনন্দিত।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select - ▼
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

পুরাভিদা কোস্টারিকা

শ্রাবণী ব্যানার্জী

~ *কোস্টারিকার আরও ছবি* ~

বেশ কয়েক বছর ধরেই বন্ধু-বান্ধব মহলে কোস্টারিকা দেশটার খুব গুণগান শুনতে পাই। বিশেষ করে যারা মার্কিন মুল্লুকের পূর্ব দিকে থাকেন তারা যেন হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে দশ-বারো ঘন্টা ধরে প্লেনে হাওয়াই যাওয়ার থেকে ঘরের কাছে কোস্টারিকাই ঢের ভালো। আগ্নেয়গিরি, উষ্ণপ্রসবণ থেকে ফল-ফুল ও সুন্দর সীবিচ্ নিয়ে এ নাকি অনেকটা হাওয়াই-এরই মিনি ভার্সান। অতএব কিছু দিন আগে আমরাও অত্যন্ত উৎসাহভরে কোস্টারিকার দিকেই রওনা হলাম। তাহলে আসুন সেখানে পৌঁছোনোর আগেই সে দেশটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ খোঁজ খবর নিয়ে নেওয়া যাক।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী দেশগুলির দিকে তাকালে মনে হয় তারা যেন একটি বড়সড় ডুগডুগির মধ্যভাগ, যেখানটিকে হাতে ধরে অতি অনায়াসেই নাড়িয়ে দেওয়া যায়। একদিকে আত্লান্তিক ও অন্যদিকের প্যাসিফিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝের এই দেশগুলি ক্ষমতা ও আকৃতি সব দিক থেকেই খুবই ছোট। কোস্টারিকাও এর ব্যতিক্রম নয়।
প্রায় দশ-বারো হাজার বছর আগে সেই সুদূর মঙ্গোলিয়া অঞ্চল থেকে শিকারের পিছু পিছু ধাওয়া করে একদা জোড়ালাগা উত্তর আমেরিকার বেরিং স্ট্রেট্ ধরে লোকজন এই মহাদেশগুলিতে প্রবেশ করে। এক সময়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য তারা সেই স্থানগুলিকে বেছে নেয় যা ছিল চাষআবাদের পক্ষে অনুকূল। তার ফলে চারিদিকে আগ্নেয়গিরি, পোকামাকড়, কুমীর ও জঙ্গলে ভরা আজকের এই কোস্টারিকা তাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল না। পনেরোশো দুই সালে চতুর্থবার আমেরিকা পাড়ি দেবার সময়ে যখনক্রিষ্টোফার কলম্বাসের জাহাজ ঝড়ে ভেঙে যায়,তিনি একান্ত নিরুপায় হয়েই এদেশের উপকূলে নোঙ্গর ফেলতে বাধ্য হন। বলাবাহুল্য তখনও তিনি এদেশে বিরাট জনসংখ্যা কিছু দেখতে পাননি, কিন্তু অবাক হয়েছিলেন স্বল্পসংখ্যক এই মানুষগুলির অসম্ভব মিষ্টি ব্যবহারে। শুধু খাবারদাবার নয়, প্রচুর সোনার জিনিস দিয়ে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত সাদা মানুষগুলিকে এমনভাবে আপ্যায়ন করেছিল যে কলম্বাসের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল এরা নিশ্চয়ই খুব ধনী, তাই স্প্যানিশ ভাষায় জায়গাটির নাম রেখেছিলেন কোস্টারিকা, যার মানে ইংরাজীতে দাঁড়ায় রিচ্ কোষ্ট। যদিও পরবর্তীকালে স্প্যানিয়ার্ডরা এদেশটিকে দখল করতে এসে সোনাদানার থেকে ঢের বেশি সাপখোপ পোকামাকড় ও কুমীরের উপদ্রব দেখে মানে মানে সরে পড়ে, কিন্তু কোস্টারিকা বা রিচ্ কোস্ট নামটি কিন্তু থেকেই যায়।
মাত্র শ'দুয়েক বছর আগে যেন প্রায় হঠাৎ করেই ইউরোপীয়ানরা আবিষ্কার করে এদেশের আগ্নেয়গিরির উর্বর মাটিতে অত্যন্ত ভালো কফি তথা কলা, আনারস ইত্যাদি ফলানো সম্ভব। তারা শুধু গাছের চারা নয়,তার সঙ্গে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে আসে বেশ কিছু গরু।যাতে সেগুলি এদেশের অফুরন্ত গাছপালা খেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে প্রচুর দুধ দিতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে চীজ-এর ব্যবসায় সুবিধে হবে। আজ সেই গরুরা শুধু চীজ উৎপাদনে নয়, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে যে রেটে বংশবৃদ্ধি করেছে তাতে রীতিমত ট্রাফিক বন্ধ রেখেই তেনারা গাড়ির রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করেন।

কোস্টারিকার রাজধানী স্যান্হোজের আকাশরেখা

কোস্টারিকার রাজধানী স্যান হোজে বিমান বন্দরে পৌঁছে টাকা ভাঙাতে গিয়ে রীতিমত অবাক হলাম। টাকার গায়ে বাঁদর, পাখি, হরিণ, জঙ্গলের ছবি দিয়ে যেন গোটা রেনফরেষ্টটাকেই চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আমরা মূল শহরে না থেকে তার লাগোয়া সুন্দর করে সাজানো লাসাবানাতে ছিলাম। আমাদের হোটেলটির লবি শুরুই হয়েছে চোদ্দতলায়, তার নীচের তলাগুলি অফিস। সে রাত্রে কাঁচেঘেরা হোটেলে বসে চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে আলোর চমক দেখে বড় ভালো লেগেছিল। এদেশের মাটিতে পা দিয়েই বুঝেছিলাম সামান্য কিছু মেলানো-মেশানো থাকলেও সাদা চামড়া অর্থাৎ ইউরোপীয়ানদের সংখ্যাই বেশি। ট্যাক্সি ড্রাইভাররা গাড়ির মিটারটিকে 'মারিয়া' বলে সম্বোধন করে। নাহ্, মিটার থেকে মারিয়া কথাটি আসেনি, এসেছে ভার্জিন মেরি থেকে। কারণ এদেশের ট্যাক্সি ড্রাইভাররা প্রমাণ করতে চায় তারা কতটা সৎ, যদিও পৃথিবীর আর পাঁচটা শহরের মত এদের সততাকেও একটু সন্দেহের চোখে দেখাই ভাল। সত্যি কথা বলতে কী গোটা দুয়েক মিউজিয়াম আর একটি বড়সড় থিয়েটার বিল্ডিং ছাড়া স্যান হোজেতে বিশেষ কিছুই দেখার নেই, তাই এদেশটিকে ভালো লাগাতে হলে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

টবে চাষ করা কফি গাছ

দেশটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই না জানায় প্রথম দুদিন ট্যুর কোম্পানীর সাহায্য নিলাম। শুরুতেই তারা নিয়ে গেল একটি কফি প্ল্যান্টেশনের জায়গায়। গাইড ঝোপের মত কফি গাছগুলির কাছে নিয়ে গিয়ে কত রকমের বীন্ থেকে আরম্ভ করে ঠিক কী কারণে কফির দামের তারতম্য হয় সেসব বোঝাতে লাগল। এখানে চকোলেটে মোড়ানো কফির দানা টেষ্ট করে এত ভালো লেগে গেল যে নিজের ব্লাড সুগারের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে একটা বড়সড় বাক্সই কিনে ফেললাম যাতে পথে যেতে যেতেই সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারি। কর্মচারীরাও অত্যন্ত বুদ্ধিমান কোনও সন্দেহ নেই, কারণ তারা নিজেরা কষ্ট করে শুকোতে দেওয়া কফি বিনগুলি না তুলে ট্যুরিষ্টদের হাতেই বেলচা জাতীয় একটা কিছু ধরিয়ে দিয়েছে যাতে তারাই সেগুলিকে বস্তায় ভরতে পারে। একজন ট্যুরিষ্টকে জিজ্ঞাসা করায় বলল তারা আমেরিকার এক অত্যন্ত

নামজাদা ট্যুর কোম্পানীর সঙ্গে এসেছে যাতে বেড়ানো ছাড়াও এদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অংশগ্রহণ করার একটা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। সেই অ্যাডভেঞ্চারের স্পিরিটেই তারা নাকি দুধ দোয়া থেকে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কুটনো কোটা মায় রান্নাবান্না পর্যন্ত করে এসেছে। ট্যুর কোম্পানীগুলোর বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্য দেখে অত্যন্ত চমৎকৃত হলাম অর্থাৎ এ শুধু ফ্রি সার্ভিস নয়, একেবারে যাকে বলে গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে ব্যাগার খাটা।

পোয়াস্ ভলক্যানোর বিষাক্ত ক্রেটার

এরপর গেলাম পোয়াস্ ভলক্যানো দেখতে যার শেষ অগ্নুৎপাতটি ঘটে ২০০৯ সালে। সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রায় গোটা চল্লিশেক মানুষ সেসময়ে এর শিকার হয়। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে নানা রঙের ফুল প্রজাপতি ও পাখি দেখেও খুব আনন্দ পেলাম বিশেষ করে টোকন্ পাখি যার ঠোঁটের সাইজ দেখলেই মাথা ঘুরে যায়। সাতশো মিটার উচ্চতায় ঝকঝকে রোদে হাল্কা ফিরোজা রঙের জলে ভরা ভলকানোর ক্রেটার দুটি দেখে সত্যিই মোহিত হয়ে গেলাম। গাইড বলল এটা জল নয়, পুরোটাই পরতে পরতে সালফার বা গন্ধক তারফলে সামান্য একটি পোকাও এখানে বাঁচতে পারে না কারণ এটাই পৃথিবীর সবথেকে বেশি অ্যাসিডে ভরা লেক। এ তল্লাটে হাঁটাটা যদিও একটু কষ্টকর, তবু একসময় হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম বোটস্ লেকে, তার রং আবার গাঢ় নীল। ফেরার পথে জঙ্গলের রাস্তায় শ্রান্ত এক মহিলা আর কতদূর হাঁটলে বোটস্ লেকটি দেখতে পাবেন জিজ্ঞাসা করায় অত্যন্ত উৎসাহভরে বললাম 'আর মাত্র পাঁচমিনিট, এই মেরে এনেছো প্রায়' তাতে ধন্যবাদের পরিবর্তে সেই বয়স্কা মহিলা রীতিমত খিঁচিয়ে উঠে বললেন, গত আধঘন্টা ধরে নাকি লোকজন ওনাকে 'ওনলি ফাইভ মিনিটস্ আর অলমোস্ট্ দেয়ার' কথাটা বলে আসছে।

বোটস্ লেক

জঙ্গলের মধ্যেই এক রেস্টুরেন্টে আমাদের মধ্যাহ্নভোজন সারা হল। এদেশের প্রধান খাদ্য দেখলাম গ্যালো পিন্টো রাইস যা কিনা পেঁয়াজ ও কালো বিন্ দিয়ে ভাজা ভাত। ইউরোপীয়ানরা আসার আগে যা ছিল এখানকার নেটিভদের খাদ্য, এখন অবশ্য সাইডে তার সাথে কলা সেদ্ধ

বা ভাজাও দেওয়া হয়। এদেশে বহু রেস্টুরেন্টেই 'সেভিচে' বলে একটা ডিস্ দেখবেন যা কাঁচা মাছ, পেঁয়াজ, আদা, লাল লঙ্কা ও পাতিলেবুর রস সহযোগে তৈরি, কাঁচা মাছে আপত্তি না থাকলে এটি যথেষ্টই মুখরোচক। এছাড়া আমাদের মাছের পাতুড়ি স্টাইলের কলাপাতায় মোড়া তামালে তো আছেই। ভুট্টার গুঁড়োর আবরণের ভেতর আলু টমেটোর পুর দিয়ে বিভিন্ন ভাজা খেতেও এরা অভ্যস্ত, যদিও আয়ারল্যান্ডের মত এদের প্রধান খাদ্য আলু নয় বা ইতালিয়ানদের মত এরা জোর কদমে টমেটোও খায় না, তবুও আমরা যেন না ভুলি কোস্টারিকার মত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিই পৃথিবীর লোকের কাছে এই খাবারগুলি তুলে ধরে। আলু আর টমেটো এই অঞ্চলের মানুষেরই আবিষ্কার। যারা আজ ধূমপানে অভ্যস্ত তারাও কি তামাকবিহীন ধূমপানের কথা ভাবতে পারতেন? কারণ তামাকও এদেরই অবদান। টমেটোপেস্টবিহীন পিৎজা, গরম গরম আলুর চপ ছাড়া মুড়ি, আলুশূন্য আলুকাবলি বা শেষপাতে একটু টমেটো চাটনি ছাড়া খিচুড়ি খাওয়ার কথা ভাবতেও যেন কষ্ট হয়। কিন্তু কলম্বাস নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করার পূর্বে অর্থাৎ মাত্র পাঁচশো বছর আগেও আমাদের তথা গোটা পৃথিবীর লোকের কাছেই এগুলি ছিল সম্পূর্ণ অজানা। সেদিন ভোজনের পর লাপাজ জলপ্রপাতের কাছে গিয়ে দেখি, সেটিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে বেশ কিছু অল্পবয়সী ভারতীয় মেয়ে বিভিন্ন পোজে হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের স্টাইলে ছবি তুলে যাচ্ছে। রকমসকম দেখে মনে হল এই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যটিকে বোধহয় এদের ভবিষ্যতে ছবিতে দেখেই উপভোগ করতে হবে। জলপ্রপাতের আশেপাশে ছোট ছোট হামিংবার্ডদের বনবন্ করে পাখা ঘোরানো দেখেও মুখ হাঁ হয়ে যায় যেন এক-একটা মিনি ফ্যান প্রচন্ড গতিতে ঘুরে যাচ্ছে।

কোস্টারিকান মধ্যাহ্নভোজন

এরপর সার্চি বলে একটি জায়গায় এদেশের হাতের কাজ দেখতে গেলাম যেখানে নানা ধরণের পাথরের মূর্তির সাথে রংবেরঙের চাকাও চোখে পড়ল। এদেশে অবশ্য কারোর কোনও তাড়া নেই, দেখলাম বেশ কিছু গরু বড় রাস্তা দিয়েই হাঁটাচলা করছে আর গাড়িগুলো ধৈর্যসহকারে তাদের চলে যাবার অপেক্ষায় আছে। একটি মেয়ে আবার বিভিন্ন স্বাদের চিজের টুকরো ট্যুরিষ্টদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, যাতে ভালোলাগা মাত্রই তাদের কাছে গছিয়ে দিতে পারে। এখান থেকে আরিনাল ভলকানো পর্যন্ত যেতে অনেকটা সময় লাগে তাই অবসর বিনোদনের জন্য আমাদের গাইড এদেশ কতটা ভালো সেই গুণগান করে কানের গোড়ায় মধুবর্ষণ করতে লাগল। গত ষাট বছর ধরেই এদেশে মিলিটারির পেছনে টাকা খরচ না করে সেই টাকায় বাচ্চাদের ফ্রিতে স্কুলে পড়ানো হয়, তার ফলে এদেশে শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ লোকজন নাকি শিক্ষিত। এদেশে বাচ্চারা স্কুলে ফ্রিতে খেতেও পায়, তাই মিলিটারির পেছনে অপচয় না করে সেটিকে সৎকাজে লাগায়। পাশ থেকে একটি অবশ্যম্ভাবী স্বগতোক্তি কানে এল - কিছু বাঁদর ছাড়া আর কেই-বা এদেশ দখল করতে আসবে যে মিলিটারির পেছনে টাকা ঢালতে হবে? কথাটার মধ্যে আংশিক সত্যতা বা যুক্তি থাকলেও পুরোটা অবশ্যই নয়। নিকারাগুয়া বা পানামার মত প্রতিবেশী দেশগুলি যেখানে কিনা অবাধে ড্রাগের ব্যবসা চলে, তারা এই মিলিটারিবিহীন দেশটিতে ঢুকে অনায়াসেই রাজত্ব চালাতে পারত, কিন্তু পারেনি শুধু একটাই কারণে যে এদের এক অতীব শক্তিশালী দাদা খুব কাছেপিঠেই আছেন যার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিবেশী দেশগুলি মোক্ষমভাবেই জানে যে এরা কার ছত্রছায়ায় আছে, তাই ঘাঁটাতে সাহস পায় না। পানামার একদা মিলিটারি লিডার মানুয়েল নরিয়েগার কথাই ভেবে দেখুন আমেরিকার সাথে এঁটে উঠতে না পেরে গত পঁচিশ বছর ধরে জেলখানার জাঁতাকলেই ইঁদুরের মত আটকে থেকে মাত্র কিছুকাল আগে দেহ রেখেছেন। অতএব অন্যের ঘাড় দিয়ে যদি সুরক্ষাটি হয়েই যায় তাহলে এরাই বা খামোকা টাকা খরচ করে মরে কেন। বুদ্ধিমান জাত কোনও সন্দেহ নেই আর দাদাগিরির ব্যাপারেও আমেরিকারও কোনও জুড়ি নেই।

বেলা হয়ে যাওয়ায় একসময় আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের জন্য নামিয়ে দেওয়া হল। রেস্টুরেন্টে হঠাৎ বাংলায় কথা শুনে চমকে উঠলাম। এক মহিলা সেলফোনে চিৎকার করে বলছেন - 'আরে ভাবতে পারবি না এদেশে পেয়ারার কী সাইজ আর তেমনি পাকা পেঁপে!' বাঙালির দর্শন পেয়ে আলাপ করার লোভটাও সামলাতে পারলাম না, শুনলাম ওনারা টেক্সাসের বাসিন্দা।

আরিনাল ভলকানো

আরিনাল ভলকানো পৌঁছে তার আশেপাশে সবুজের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যদিও বহুদিনই অগ্নুৎপাত হয়নি তবু সে এখনও জীবন্ত। এই আগ্নেয়গিরির দেশে আশেপাশে উষ্ণপ্রস্রবণ বা হট্ স্প্রিং থাকাটা আদৌ অস্বাভাবিক নয় আর এরপর সেরকমই একটি জায়গায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল।

বলডি উষ্ণ প্রস্রবণে মদিরা সহযোগে অবগাহন

এই বলডি উষ্ণ প্রস্রবণের এলাকাটি এতটাই বড় ও চারিদিকে এমনভাবে গাছপালা ও ফুল দিয়ে সাজানো যে ঢুকলে রীতিমত তাক্ লেগে যায়। প্রায় গোটা পনেরো বিশাল গরম জলের পুল যার কোথাও ওপর থেকে ঝরনার মত জলের ধারা আর কোথাও বা বাচ্চাদের জন্য পেল্লাই ওয়াটার স্লাইড। শুধু তাই নয় অনেক পুলের মধ্যে আবার বড় বড় ভাসমান বার যাতে শরীর ডুবোনো ও সুরাপান দুটি কাজ এক যোগেই সারা যায়। সামলাতে না পারলেও কোনও আনন্দরসে বঞ্চিত হওয়াই আমার ধর্ম নয়, তাই মদিরাহস্তে আমিও শরীরটাকে গরম জলে ডুবিয়ে দিলাম। কিঞ্চিৎ পান করার পরই মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, অগত্যা পানীয় শেষ করার দিকে নজর না দিয়ে বার-এর মূল্য চোকাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বারটেন্ডার হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ভাবখানা এমন –
এখনও তোমার পান, বন্ধু, হয়নিতো অবসান
তবু এখনি যাবে কি চলি -
সে রাত্রের ডিনার আগ্নেয়গিরির পাদদেশে একটি রেস্টুরেন্টে সারা হল। চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা রেস্টুরেন্টের পাশেই আবার একটি হোটেল যার সম্মুখে হেলিপ্যাড। চারিপাশে রংবেরঙের ফুল ঝরনা সবকিছু নিয়ে যাকে বলে একেবারে এলাহি কান্ড। রাত্রে এ জায়গা দেখলাম আবার নবরূপে জেগে উঠল। বিভিন্ন রঙের আলো ফুল ঝরনার ওপর পড়ে যেন এক স্বপ্নপুরীর আকার নিল, ইংরাজিতে যাকে বলে ম্যাজিকাল অ্যাটমোস্ফেয়ার।

স্বপ্নপুরী

শেষ তিনদিন আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে মানুয়েল আন্তোনিয়ে বলে একটি জায়গায় ছিলাম। জঙ্গল, ক্যানোপি ট্যুর ও সুন্দর সীবিচ্ ছাড়াও এ জায়গাটি তার ন্যাশনাল পার্কের জন্য বিখ্যাত। সকাল সাতটায় খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকে পড়লে জীবজন্তু বেশি দেখার সম্ভাবনা, কারণ সেটা তাদের প্রাতরাশের সময়। সাইনবোর্ডে লিখিতভাবে মানা করা হলেও দেখলাম কিছু ট্যুরিষ্ট বাঁদরদের বাদাম খেতে দিচ্ছে কারণ তারা নাকি অত্যন্ত কিউট! কেউ কেউ জঙ্গলে টারজানের মত খেল দেখাচ্ছে আর কেউবা পূর্ণ উল্লাসে ট্যুরিস্টদের পেছনে লেগেছে। আমার চোখের সামনেই এক বাঁদর গাছ থেকে ঝুলে এক ভদ্রলোকের মাথা থেকে বেসবল ক্যাপ হাওয়া করে দিল আর একটি বাঁদর একটি পিকনিক টেবিল থেকে সোডার বোতল নিয়ে চম্পট দিল। চালচলনে নিঃসন্দেহে তেনারা কিউট্, যতক্ষণ আমার নয় অন্যের মাথার টুপি টার্গেট করছে। এক আমেরিকান মহিলার সঙ্গে সামান্য গল্প জুড়েছিলাম কিন্তু সেই অন্যমনস্কতার সুযোগে এক বাঁদর সেল্ফিস্টিক্ সমেতই ক্যামেরাটিকে সটান্ তার কাছে টেনে নিল। রাগার পরিবর্তে ভদ্রমহিলা তো হেসেই খুন ভাবখানা এমন আহা বাঁদর বলে কি একটু সেল্ফি তোলার সখ হতে নেই? অগত্যা অন্যের ক্যামেরা ধরা অবস্থায় আমিই বাঁদরটির একটি ছবি তুলে নিলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম ঠিক আমার মাথার ওপরেই গাছে একটি স্লথ শুয়ে আছে, অতএব বেশীক্ষণ তার তলায় দাঁড়ানোর ঝুঁকিটা আর নিলাম না।

মানুয়েল আন্তোনিয়েতে সাদামুখো বাঁদর পরিবার

ন্যাশনাল পার্কের বাইরেই দেখলাম লোকজন ডাব বিক্রি করছে। কাছে যেতে বলল এক একটি চার ডলার। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন এঁরা নিজেদের কারেন্সির বদলে ডলারে দাম বলাটাকেই সুবিধাজনক বলে মনে করেন। দাম শুনেই মাথা চড়ে গেল যেখানে চারিদিকে নারকেল গাছের সারি সেখানে ডাবের এত দাম হয় কি করে? ঝগড়া করার অদম্য ইচ্ছা থাকলেও আমার স্প্যানিশের যা দৌড় তাতে ভাষার পরিবর্তে সদ্য দেখে আসা বাঁদরদের মত কিছুটা দাঁতমুখ খিচোনোই সার হত। তাছাড়া গাছে যতই ডাব ঝুলুক না কেন সেগুলিকে নামিয়ে আনার ক্ষমতা যেখানে আমার নেই সেক্ষেত্রে দাম নামানোর দিকে মনঃসংযোগ করাই ভাল। চার থেকে দুই-এ নামাতে পেরেই নিজের ওপর কনফিডেন্স বেড়ে গেল,

তাই দুটি ডাব কিনে গাছের তলায় গিয়ে বসলাম। এমন সময় একটি হরিণ ছলোছলো নয়নে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আহা এ যেন একেবারে পিওর শকুন্তলার সিন্, তাই অনতিবিলম্বে তাকেও ক্যামেরাবন্দী করে ফেললাম।
সারাদিন সমুদ্রের তীরে বসে বেগুনপোড়া হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই একটা পাবলিক বাস নিয়ে একটু গ্রামের দিকে চলে গেলাম। বাস দেখে তো আমি হাঁ একেবারে সুন্দর ঝকঝকে গদিআঁটা এসি বাস আর ভাড়াও অত্যন্ত কম। জানলার দিকে তাকিয়ে চারিদিকে জবা, কলকে, রঙ্গন, কৃষ্ণচূড়া আর আম কলা পেয়ারা ও নারকেল গাছের সারি দেখে আমার ছোটবেলায় বেড়ে ওঠার জায়গাটির কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল। এখন অবশ্য তা শুধু স্মৃতিতেই হাতড়ানো সম্ভব, গাছপালার পরিবর্তে এখন সেখানে শুধুই কংক্রিটের জঙ্গল। এক জায়গায় বাস কিছুক্ষণের জন্য থামল, দেখলাম গ্রাম বাংলার মতই বেশ বড়সড় একটা হাট বসেছে। ফল-সবজি থেকে মাটির হাঁড়ি, গয়না, আখের রস সবই বিক্রি হচ্ছে অনেকটা যেন কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ির সেই হাটের পটভূমি। পাকা আম দেখে খাবার ইচ্ছা হলেও ছুরি নেই, সেটি অভিনয়ের দ্বারা বোঝানোর সাথেসাথেই লোকটি আমটিকে ভালো করে ধুয়ে ছুরি দিয়ে কেটে কলাপাতার ওপর সাজিয়ে পরিবেশন করল। এক মহিলা দেখলাম বিরাট বাদামী রংএর লোমওয়ালা একটা খোলা থেকে কীসব বার করে মুখে দিচ্ছে। ইশারায় কী জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথেই কয়েকটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে খেয়ে দেখতে বললেন আর পাছে ভেতরের বিশাল দানাটিকে ভুল করে গিলে ফেলি তাই খাওয়ার পদ্ধতিটাও দেখিয়ে দিলেন। মুখে দিয়ে মনে হল আঁশফল খাচ্ছি। লালচে রঙের দিশি আমড়ার মত একটা কিছু বিক্রি হচ্ছে যার নাম নান্জি। পড়ে জানলাম সেটা নাকি অরিজিনাল কোসটারিকান ফল যা পচিয়ে আজও স্থানীয়রা নেশা করে আর তার সাথে আখের রস নেশা আরো জোরদার করতে সাহায্য করে।

হাটের ফলওয়ালা

এদেশের মাটিতে পা দেবার সাথে সাথেই 'পুরাভিদা' কথাটার কী মাহাত্ম্য তা বুঝে গিয়েছিলাম। কিঞ্চিৎ হাসিহাসি মুখের সঙ্গে এই কথাটা বললেই দেখবেন আপনি বহুজায়গায় উৎরে যাচ্ছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে একটি মেক্সিকান সিনেমায় শব্দটা ব্যবহার করা হয় যা ইংরাজী করলে দাঁড়ায় 'পিওর লাইফ।' এদেশে কিন্তু এ শব্দটির প্রয়োগ এমনই, যা সব ট্রান্সেসনেরই উর্ধ্বে। স্প্যানিশে 'ওলা' যা কিনা ইংরাজীতে 'হ্যালো' তা অবশ্যই এদেশে চলে কিন্তু 'পুরাভিদা' বললে আপনি চট্ করে হয়ে যাবেন এদের খুব কাছের মানুষ। রাস্তায় কারোর সাথে দেখা হলে তাকে 'ওলা' বা 'হ্যালো' না বলে আপনি বললেন 'পুরাভিদা' অর্থাৎ নমস্কারের পরিবর্তে সৌজন্য বিনিময়ের জন্য বললেন - কি ভাই সব ভালো তো? কথাবার্তা চালানোর মধ্যে পুরাভিদা বললে মানেটা দাঁড়ায় - আর ভাই এই তো জীবন, বেশি চাপ নিও না। বাক্যালাপের শেষে বলার অর্থ - আচ্ছা ভাই তাহলে আসি, আবার দেখা হবে। এদেশের মত একটা কথার জোরে সারা না গেলেও আমেরিকায় 'পুরাভিদা' অনেকটা হয়ে দাঁড়ায় প্রারম্ভে - হে হোয়াটস্ আপ ? কথাবার্ত্তা চলার মাঝখানে - দিস ইজ্ লাইফ ম্যান্, টেক্ ইট ইজি। শেষে গুড বাই এর বদলে পুরাভিদা হয়ে যায় - 'সি ইউ, টেক্ কেয়ার।'
শেষ দিনটাতে আমরা 'হাকো' বলে একটা সমুদ্র তটে গেলাম, ইংরাজিতে 'জাকো' পড়ে যতই গগন ফাটান না কেন স্প্যানিশে জ এর উচ্চারণ 'হ' এর মত হয় অর্থাৎ জাকো হয়ে যাবে 'হাকো'। এখানে নেমে ম্যাকেডানাল্ড, পিৎজা হাট আর কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেনের রমরমা দেখে খেয়াল করলাম এ তল্লাটে আমেরিকানদের ছড়াছড়ি। তার ফলে রাস্তাঘাট বা দোকানপাটে অনেকেই ইংরাজি বলেন। আশেপাশে প্রচুর আগ্নেয়গিরি থাকায় সমুদ্রতটে বালির রং কালো, যদিও জল খুব পরিস্কার। গ্রামগঞ্জে বা শহরে যেখানেই যান না কেন এদেশে দেখবেন বাচ্চারা রাস্তাঘাটে ফুটবল খেলে যাচ্ছে কারণ বাঙালিদের মত এদেরও ফুটবল-অন্ত প্রাণ আর হাকোও তার ব্যাতিক্রম নয়। এই জায়গাটিতে ট্যুরিষ্টের সংখ্যাই বেশি তাই রাত্রে এই সমুদ্রতটটি পার্টির আনন্দে মেতে ওঠে।

আমাদের দেশের মত এদেশেও দেখলাম লোকজন ডিরেকশন দেওয়ার সময় রাস্তার নামের ধার ধারে না, ল্যান্ডমার্কের ওপর ভরসা করেই জবাব দেয়। যেমন ধরুন, কাউকে ম্যাকডোনাল্ডের ডিরেকশন জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাবেন - পাঁচশো মিটার উত্তরে গিয়ে বাঁহাতের রাস্তা নিয়ে কিছুটা এগোলেই একটা স্টেডিয়াম দেখতে পাবে আর তার ঠিক পেছনেই ম্যাকডোনাল্ড। সেখানে ঢুকে আবার দেখবেন হাইজিনের কী কড়াকড়ি, প্রত্যেকের মাথাই জাল দিয়ে ঢাকা যাতে চুল উড়ে এসে খাবারে না পড়ে। হোটেলের কর্মচারীটি বলল এখানে গ্রামদেশে কোথাও কোথাও রাস্তার নামই থাকে না সেখানে কোন হলুদ রঙের বাড়ির সামনে সাদা গরু বাঁধা আছে তার ওপর নির্ভর করেই ডিরেকশন দেওয়া হয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে মিল বহুদিক থেকেই। মুশকিল একটাই, এধরনের ডিরেকশনের আয়ু ততদিনই যতদিন তেনারা গায়ের রঙের দিক থেকে একই আছেন। দুঃখের বিষয় গরু বা বাড়ির মধ্যে কেউ একটি রং পরিবর্তন করলেই সেটি সুকুমার রায়ের 'ঠিকানা' হয়ে দাঁড়ায়।
এদেশে অত্যন্ত স্বল্প জনসংখ্যা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে অমিল থাকলেও ফলফুল বা আরও বহুদিক থেকে মিলটাও চোখে পড়ার মত। সময়ের অভাবে এবারে আর অতলান্তিকের দিকটা যাওয়া হল না, তাই সেটিকে ভবিষ্যতের জন্যই তুলে রাখলাম।

এদেশে এসে চারিদিকে আমার অত্যন্ত পরিচিত ফুল ফলের গাছগুলিকে দেখে বা কল্কে ফুল আঙ্গুলে পরে কিছুক্ষণের জন্যও যেন আমি আমার ছেলেবেলার ফেলে আসা আনন্দের স্মৃতিটাকে ফিরে পেয়েছিলাম, যার মূল্য আমার কাছে অপরিসীম। তাই কোস্টারিকাকে বিদায় জানানোর সময় হয়ে এলেও তাকে ঠিক 'গুড বাই' বলতে মন চাইল না পরিবর্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল - 'পুরাভিদা কোস্টারিকা' তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, টেক কেয়ার।

মানুয়েল আন্তোনিয়ে সৈকতে

~ *কোস্টারিকার আরও ছবি* ~

শ্রাবণী ব্যানার্জীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চা ও ইতিহাসপাঠে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত করে বেড়াচ্ছেন।

কেমন লাগল : - select -
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

বর্ণময় প্রাগ

কণাদ চৌধুরী

~ *প্রাগের আরও ছবি* ~

স্টুটগার্ট থেকে ফ্রাংকফুর্ট হয়ে নুরেমবার্গ - এইটুকু ট্রেন। তারপরে বাসে চড়ে প্রায় সাড়ে-তিন থেকে চার ঘন্টার রাস্তা পেরিয়ে প্রাগ। নুরেমবার্গে ট্রেন থেকে নামার পরে বাসটা কোথা থেকে ছাড়বে, সেটা খুঁজে বার করতে করতে বাস ছেড়ে যাওয়ার সময় প্রায় চলে যায় আর কী!! বড়মেয়ে বিবাহসূত্রে জার্মানিতে বসবাস শুরু করার পরে আমাদের এই প্রথম এদেশে আসা। গত দু-বছরে ইউরোপের অনেকটাই চষে ফেললেও মেয়ে এই প্রথম একার দায়িত্বে বাপ-মা কে নিয়ে বেরিয়েছে ইউরোপের একটা ছোট্ট টুকরো দেখাতে, সম্ভাব্য বাস মিস হওয়ার টেনশনে তার কাহিল অবস্থা। শেষ অবধি একটু জিজ্ঞাসাবাদ আর দৌড়াদৌড়ি করে বাসের দেখা মিলল। মস্ত দোতলা ডয়সে বানের বাস, তার চেহারাখানা দেখতে পাওয়ার পরেই আমাদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মালপত্র জমা করে দোতলায় উঠে এক্কেবারে সামনের সারিতে আমাদের তিনজনের সিটে গুছিয়ে বসতে না বসতেই বাস দিল ছেড়ে। বাসের অভ্যন্তরটি বেশ বিলাসবহুল। পয়সা দিলে মিলবে শীতল বিয়ার থেকে শুরু করে উষ্ণ কফি, যা আপনি চাইবেন। পানীয়ের সঙ্গে মিলবে খাদ্যও, চাইলে ওয়াই-ফাই দিয়ে আপনি যুক্ত থাকতে পারেন আন্তর্জালে, আছে বিনোদনের জন্য চলচ্চিত্র দেখার সুবিধা, রয়েছে টয়লেট,ব্যবস্থা সব একেবারে এরোপ্লেন কিংবা ট্রেনের মতই।

বাস ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল নুরেমবার্গ শহরের মধ্যে দিয়ে। প্রথমে সামান্যই রাস্তা শহরের ভিতরে, তারপরেই বাস গিয়ে পড়ল জার্মানির বিখ্যাত হাইওয়ে – অটোবান-এ। আকাশ একটু মেঘলা হয়ে আছে, তবে বৃষ্টি নেই। প্রাণভরে দুই পাশের মনভুলানো,চোখজুড়ানো সবুজের সমারোহ দেখতে দেখতে পথ চলেছি। অনুমান করতে পারছিলাম, বাসের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় একশো কিমি, কিন্তু যেসব ছোট-ছোট গাড়ি বাসকে পাশ কাটিয়ে হুউউশ করে চোখের পলকে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, তাদের গতিবেগ ঘণ্টায় দুশো-আড়াইশো কিমি-র কম হবেনা কিছুতেই। জার্মানির অভ্যন্তরে অটোবানে গাড়ির গতিবেগের ওপরে কোনও উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া নেই, তবে চেক প্রজাতন্ত্রে প্রবেশ করার পরে আর এই লাগামছাড়া গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়, সেখানে নিয়মকানুন আলাদা। অটোবানের পাশে একজায়গায় চোখে পড়ল বেশ কিছু উইন্ডমিল। অপ্রচলিত শক্তির সন্ধানে এখন সকলেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নেদারল্যান্ড উইন্ডমিলের জন্যে বিখ্যাত হলেও জার্মানিতেও তাদের দেখা মিলল বেশ কয়েক জায়গায়। প্রায় তিনশো কিমি রাস্তা পাড়ি দিয়ে নুরেমবার্গ থেকে প্রাগে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগল প্রায় চার ঘণ্টা।

বোহেমিয়া, মোরাভিয়া এবং সিসেলিয়া এই তিনটে অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া ভাঙে তৈরি হওয়া বর্তমানের চেক রিপাবলিক বা চেকিয়া দেশটি। এই দেশকে ঘিরে রয়েছে জার্মানি, পোল্যাণ্ড, স্লোভাকিয়া এবং অস্ট্রিয়া - ইউরোপের এই চারটি দেশ। চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগ বা প্রাহা শহরের ইতিহাস প্রায় এক হাজার বছরের পুরোনো। শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ভ্লাতভা নদীর ওপর সুদৃশ্য সেতু, অসংখ্য চার্চের সোনা বাঁধানো সুউচ্চ মিনার আর গম্বুজ, সুবিশাল প্রাগ দুর্গ, পুরোনো শহরের পাথরে তৈরি রাস্তা, অজস্র ঐতিহাসিক বাড়িঘর - সব মিলিয়ে প্রাগ ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম, যাকে বলা হয় "এ সিটি অফ হানড্রেড স্পায়ার্স।" রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয় শহরের বাড়িগুলোর দিকে। গথিক, বারোক, রোকোক, রোমানেস্ক নানান ধরণের স্থাপত্যের অজস্র উজ্জ্বল উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। ১৯৪৫ সালের পরে শহরের পুনর্গঠনের সময় এইসব প্রাচীন স্থাপত্য এবং আধুনিক বাড়িঘরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখার সুপরিকল্পিত চেষ্টার ফলে প্রাগ ইউরোপের সবচেয়ে সুসংরক্ষিত শহরগুলোর একটি। পুরনো শহরের কেন্দ্রস্থলের মধ্যযুগীয় চেহারাটা প্রায় অবিকৃত থাকার জন্য ১৯৯২ সালের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় প্রাগ শহরের কেন্দ্রস্থলটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু বিখ্যাত ব্যাক্তি যেমন কেপলার, মোজার্ট, কাফকা, আইনস্টাইন আর ভাকলাভ হাভেল, এদের নামও যুক্ত হয়েছে এই শহরের ইতিহাসের সঙ্গে।

হোটেলে পৌঁছে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল প্রাগের পুরনো শহরের দিকে। হোটেলের সামনেই ট্রামস্টপ,মেট্রো

স্টেশনও বেশি দূর নয়। আমাদের আজকের গন্তব্য ছিল ওয়েনসেলাস স্কোয়ার আর তারপরে ওল্ড টাউন স্কোয়ার। প্রাগ শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ওয়েনসেলাস স্কোয়ার অনেকটা আমাদের কলকাতার বিবাদী বাগ বা ধর্মতলা অঞ্চলের মতো শহরের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র। নামে স্কোয়ার হলেও,এটি প্রায় এক কিমি লম্বা, অতি প্রশস্ত আয়তাকার একটি ব্যুলেভার্দ, যার দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে রয়েছে চেক ন্যাশনাল মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের সামনে রয়েছে, যার নামে এই জায়গাটির নামকরণ হয়েছে, বোহেমিয়ার ডিউক সেই সেন্ট ওয়েনসেলাসের একটি মূর্তি, এটিকে বলা হয় 'ওয়েনসেলাস মনুমেন্ট।'

ওয়েনসেলাস স্কোয়ারে চেক ন্যাশনাল মিউজিয়াম

ব্যুলেভার্দ-এর দুই পাশে সার দিয়ে রয়েছে একের পর এক বিশাল অট্টালিকা, অফিস, হোটেল, বড় বড় দোকান আর নানাবিধ রেস্তোঁরা। প্রাগের বিভিন্ন মিটিং-মিছিল এবং বিক্ষোভ সমাবেশের জন্যেও এই স্থানটি খুব জনপ্রিয়। ১৯৮৯ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান বা 'ভেলভেট রেভলিউশন'-ও সংগঠিত হয়েছিল এই ওয়েনসেলাস স্কোয়ারেই। মেট্রো স্টেশন থেকে রাস্তায় বেরিয়েই দেখতে পেয়েছিলাম আমাদের বহুপরিচিত কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকা নিয়ে একদল লোক ওয়েনসেলাস মনুমেন্টের নীচে জমায়েত হয়েছে, সম্ভবত কোনও বিক্ষোভ কর্মসূচী নিয়ে। কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান হলেও চেক রিপাবলিকে বামপন্থীরা এখনও রাজনৈতিক ভাবে যথেষ্ট সক্রিয়। সন্ধেবেলায় ওয়েনসেলাস স্কোয়ারে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে, যাদের মধ্যে আমাদের মতো পর্যটকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। মানুষজন আর দোকানপাট দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে রাস্তাটি গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে প্রাগের 'ওল্ড টাউন' বা পুরনো শহরের এলাকা। প্রচুর জানা-অজানা ব্র্যান্ডের দোকানের মাঝে চোখে পড়ল আমাদের দেশের অতি পরিচিত ব্র্যাণ্ড 'বাটা।' প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, 'বাটা'-সাহেব ছিলেন এই চেক দেশেরই মানুষ।

প্রাগে তৃতীয় দিনের সকালটি আমরা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম ইউনেস্কো হেরিটেজ তালিকায় অবস্থিত শুধু এই ওল্ড টাউন অঞ্চলটি পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখব বলে,তাই প্রথমদিন বিকেলে শুধু ওল্ড টাউন স্কোয়ারের বিখ্যাত অট্টালিকা আর চার্চগুলো একটু চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম। ওল্ড টাউন স্কোয়ারের বিশাল চত্বরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি বিখ্যাত চার্চ - গথিক শৈলীর 'চার্চ অফ আওয়ার লেডি বিফোর টিন', আর পাশে রোকোক স্থাপত্যশৈলীর 'গোল্জ-কিনস্কী প্যালেস', বারোক শৈলীতে নির্মিত 'সেন্ট নিকোলাস চার্চ', স্কোয়ার-এর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ধর্মীয় সংস্কারক য়ান হৌস-এর স্মৃতিতে নির্মিত 'য়ান হৌস মেমোরিয়াল' এবং আরো কয়েকটি প্রাচীন সৌধ, যেগুলির নজরকাড়া স্থাপত্য উল্লেখের দাবি রাখে।

ওল্ড টাউন স্কোয়ারে য়ান হৌস মেমোরিয়াল

আর রয়েছে,'ওল্ড টাউন হল' এবং তৎসংলগ্ন মধ্যযুগীয় 'অ্যাস্ট্রোনমিকাল ক্লক',যেটা প্রাগ শহরের একটা অতি বিখ্যাত দ্রষ্টব্য। টিকিট কেটে টাউন হলের ওপরে উঠে ওল্ড টাউন স্কোয়ারের সুন্দর বিহঙ্গম-দৃশ্য অবলোকন করা গেল, টাউন হলের গবাক্ষপথে চোখে পড়ল পড়ন্ত বিকেলের আলোয় বিশাল প্রাগ দুর্গের রাজকীয় সৌন্দর্য। ওল্ড টাউন স্কোয়ারে প্রচুর পর্যটকের ভিড়, তাদের কাছ থেকে দু-পয়সা রোজগারের আশায় ঝলমলে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা খদ্দের ধরতে ব্যস্ত, চলছে ম্যাজিক শো, মাদারি-কা-খেল, কেউবা রঙ মেখে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে,কেউবা বাদ্যযন্ত্রে তুলছে জনপ্রিয় পাশ্চাত্য গানের সুর। প্রাগের বিখ্যাত মধ্যযুগীয় 'অ্যাস্ট্রোনমিকাল ক্লক'-টি খুলে নেওয়া হয়েছে মেরামতির জন্য, প্রমাণমাপের পর্দায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভেসে উঠছে তার কার্যকলাপের প্রতিচ্ছবি, সেটা দেখেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন সারা পৃথিবী থেকে আগত পর্যটকের দল। রাত অবধি ওল্ড টাউন স্কোয়ারে ঘুরে ফিরে একটা চিনে রেস্তোঁরায় রাতের আহার সেরে ফিরে যাওয়া হল হোটেলে।

প্রাগে দ্বিতীয় দিন একটু সকাল সকাল বেড়িয়ে পড়া হল হোটেল থেকে। উদ্দেশ্য ছিল সকাল নয়টা নাগাদ পর্যটকদের ভিড় বাড়ার আগে আগেই প্রাগ ক্যাসলে পৌঁছে যাওয়া। সকালবেলা দেখলাম একজন পুরুষ এবং একটি মহিলা হোটেলের সামনের ট্রামস্টপের ছাউনিটি পরিষ্কার করতে লেগে পড়েছেন। যে যত্ন নিয়ে ওঁরা কাজটা করছিলেন,এখানে আমাদের দেশে আমরা নিজেদের বাড়ি অতটা যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করিনা। আর রাতে হোটেলে ফেরার সময় দেখেছি, জনগণ জায়গাটা বিন্দুমাত্র অপরিষ্কার করে রাখেনি, একটা কাগজের টুকরো পড়ে নেই কোথাও, নেই একটা পানের পিকের দাগ। ইউরোপের যে ক'টা জায়গা দেখলাম এবার, সেখানকার এই পরিচ্ছন্নতার দিকটা মনকে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছে। ট্রামস্টপে টাঙিয়ে রাখা সময়-সারণীতে নির্দিষ্ট সময় মেনেই আমাদের ট্রাম এল। পরিবেশবান্ধব এই গণ-পরিবহণ মাধ্যমটি শুধু প্রাগে নয়, ভিয়েনা এবং ব্রুসেলসেও দেখেছি বেশ জনপ্রিয়। মিনিট পনেরো পরে গিয়ে নামলাম প্রাগের দুর্গের গেটে। সকাল থেকেই পর্যটকদের ভিড় জমছে সেখানে, ট্যুরিস্ট বাস থেকে দলে দলে নামছেন দেশ-বিদেশের পর্যটকের দল, যাদের মধ্যে আবার চিনা এবং জাপানিদের সংখাধিক্য চোখে পড়ার মত। দুর্গের প্রবেশদ্বারে বেশ জোরালো এক দফা খানাতল্লাশির বেষ্টনী পেরিয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া গেল অবশেষে।

প্রাগ ক্যাসেল

প্রাগ ক্যাসল বা চেক ভাষায় 'প্রাসস্কি হ্রাট' (Pražský hrad) গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের তথ্যানুযায়ী বিশ্বের প্রাচীন দুর্গগুলির মধ্যে বৃহত্তম। প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ বর্গফিট অর্থাৎ প্রায় আঠারো একর জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে দুর্গটি। আনুমানিক ৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এই দুর্গটি তৈরির কাজ শুরু হয়। বোহেমিয়া তথা ইউরোপের অন্যান্য শাসকদের হাতে এর কলেবর বৃদ্ধি পেতে পেতে এটি বর্তমানে এর এখনকার চেহারায় এসেছে। ১৯১৮ সাল থেকেই এই দুর্গ তদানীন্তন চেকোশ্লোভাকিয়ার এবং এখনকার চেক রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতির সরকারি আবাসস্থল। দুর্গদর্শনের জন্য তিন ধরনের টিকিট আছে, আমরা কেটেছিলাম সার্কিট 'এ'-র টিকিট। এই টিকিটে আমরা দেখব সেন্ট ভিটাস ক্যাথিড্রাল,পুরোনো রাজপ্রাসাদ,সেন্ট জর্জেস বাসিলিকা, গোল্ডেন লেন এবং রসেনবার্গ প্রাসাদ।
প্রাগ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত সেন্ট ভিটাস ক্যাথিড্রাল চেক রিপাবলিকের সবচাইতে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ রোমান ক্যাথলিক গির্জা, যার দায়িত্বে রয়েছেন প্রাগের আর্চবিশপ। গথিক স্থাপত্যশৈলীর এই গির্জাটি তৈরির কাজ শুরু হয় আনুমানিক ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। বেশ কয়েক শতক ধরে এই চার্চের বিভিন্ন অংশের নির্মাণের কাজ চলতে থাকলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে এটি খুলে দেওয়া হয় ১৯২৯ সালে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াও, চেক রাজা-রানিদের রাজ্যাভিষেক এই চার্চেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকত। চেক রাজা, নানা সাধু-সন্ত এবং বিভিন্ন রাজপুরুষের মরদেহও সমাহিত হয়েছে এই চার্চেই। মূল বেদিটি ঘিরে রয়েছে বেশ কয়েকটি চ্যাপেল, যার মধ্যে বোহেমিয়ার রক্ষাকর্তা সন্ত ওয়েনসেলাসের নামাঙ্কিত চ্যাপেলটি সর্বপ্রধান এবং সবথেকে আকর্ষণীয়।

সেন্ট ভিটাস ক্যাথিড্রালের অভ্যন্তরে ওল্ড আর্চবিশপ'স চ্যাপেল

চ্যাপেলগুলোর সুউচ্চ রঙিন কাচের জানালার ওপর আঁকা রয়েছে খ্রীষ্টধর্ম এবং বোহেমিয়ার রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃশ্য। এমনিতে কোনটা চার্চ, কোনটা চ্যাপেল, কোনটা ক্যাথিড্রাল আর কোনটাই বা কনভেন্ট,এসব ব্যাপারে আমি বিশেষ ভাবে অজ্ঞ, গির্জার অভ্যন্তর চাক্ষুষ দেখার অভিজ্ঞতাও বড়ো একটা নেই। তাই এই ক্যাথিড্রালের ভিতরে ঢুকে সেটার বিশালত্ব, বৈভব আর চোখ-ধাঁধানো অলঙ্করণ দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলাম। তবে বলতে দ্বিধা নেই, এযাত্রা যে কয়েকটা নামি ও দামি গির্জাদর্শন হয়েছে, সেখানে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ নিয়ে দেখেছি গির্জার ভিতরে রাখা পাইপ-অরগানগুলো। এই গির্জাটা মোটামুটি ভাবে ঘুরে দেখতে সময় লাগল ঘণ্টাখানেক। তারপরে পুরনো রাজ-প্রাসাদ আর দুর্গের ইতিহাসের ওপর একটা ছোট প্রদর্শনী দেখে গেলাম গোল্ডেন লেন দেখতে। বোহেমিয়ার রাজমুকুটের একটি প্রতিকৃতি এবং রাজা-রানিদের ব্যবহৃত কিছু মুল্যবান ঐতিহাসিক সামগ্রী এই প্রদর্শনীতেই রাখা রয়েছে। মূল জিনিসগুলি রাখা হয়েছে চার্চের ভিতরের একটি সুরক্ষিত কক্ষে, যেগুলি সচরাচর জনসমক্ষে আনা হয়না।
প্রাগের দুর্গের ভেতরে যেসব দ্রষ্টব্যগুলো দেখলাম, তারমধ্যে এই 'গোল্ডেন লেন' জায়গাটা আমার বেশ মজাদার লেগেছে। এক চিলতে গলির একধারে ছোট্ট ছোট্ট রঙিন বাড়িগুলো দেখতে দারুণ মজার লাগে, অনেকটা পুতুলখেলার বাড়িঘর বলে মনে হয়। ভিতরের

জায়গা খুবই কম, ওই স্বল্পপরিসরে মানুষজন সেইসময় কিভাবে বসবাস করতেন সেকথা ভাবলে অবাক লাগে। কোনও একসময় দুর্গের প্রহরীদের থাকার জায়গা ছিল এই বাড়িগুলো, তারপরে স্বর্ণকারদের বসবাস হওয়ার ফলেই সম্ভবত রাস্তাটির নাম হয় 'গোল্ডেন লেন।' এখন অধিকাংশ বাড়িতেই চলছে স্যুভেনিরের দোকান। কয়েকটা বাড়ির ভিতরটাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এমনভাবে, যাতে সেই পুরোনো দিনের বাসিন্দারা কিভাবে ওইটুকু জায়গার মধ্যে থাকতেন ও নিজেদের জীবিকানির্বাহ করতেন, সে সম্পর্কে দর্শকেরা একটা ধারণা পেতে পারেন। রয়েছে সেইসময়ের স্বর্ণকারের দোকান, সরাইখানা,দর্জির দোকান ইত্যাদির প্রায় অবিকল প্রতিরূপ। এই রাস্তার বাইশ নম্বর বাড়িতে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক ফ্রাঞ্জ কাফকা - বাড়িটি এখন তাঁর বই আর কাফকা-সংক্রান্ত অন্যান্য স্যুভেনিরের দোকান। দ্বিতীয় দিনের প্রথমার্ধ প্রাগ দুর্গে কাটিয়ে, বিকেল ও সন্ধে কাটানো হল ভ্লাতভা নদীর ধার দিয়ে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে আর ভ্লাতভা নদীর ভিতরে কামপা আইল্যাণ্ডে। দেখা হল কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক 'জন লেনন ওয়াল।' আর দিনের শেষে প্রাগের এক ঐতিহ্যশালী কফি হাউস, একশো বছরেরও বেশি পুরোনো 'ক্যাফে ল্যুভর'-এ কফি নিয়ে বসে কাটানো গেল কিছুটা সময়।

গোল্ডেন লেনের পথে

তৃতীয় দিনের সকালে মেয়ে আমাদের জন্য একটা ট্যুরের টিকিট কেটে রেখেছিল। একজন ইংরেজিভাষী গাইডের সঙ্গে প্রাগের ওল্ড টাউন আর জ্যুইশ কোয়ার্টার অঞ্চল আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরব এবং গাইড আমাদের প্রাগের এই দুটি অঞ্চলের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলির ঐতিহাসিক দিক ও অন্যান্য বিশেষত্বগুলি সম্পর্কে অবহিত করবেন, এটাই 'ওয়াকিং ট্যুর'-এর অর্থ। ইউরোপের অনেক শহরেই এই ধরনের 'ওয়াকিং ট্যুর' পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাধারণত, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পাঠরত অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরাই এই গাইডের কাজ করে থাকে। কিছু ট্যুর আছে যেখানে একটা নির্দিষ্ট মূল্য ধরা থাকে, আবার কিছু ট্যুর আছে যেগুলো 'টিপস' নির্ভর, অর্থাৎ ট্যুরের শেষে পর্যটক খুশি হয়ে যা দিলেন, সেটাই ট্যুরের দক্ষিণা। আমাদের ট্যুরটি ছিল দ্বিতীয় ধরনের। শুনলাম সকালে একটা নির্দিষ্ট সময়ে 'পাউডার টাওয়ার' এর নিচে সবুজ ছাতা মাথায় দিয়ে আমাদের গাইড দাঁড়িয়ে থাকবেন, ওই ছাতাটাই তাঁর পরিচয় চিহ্ন। যদিও বিগত দুই দিনে প্রাগের ওল্ড টাউনের সঙ্গে আমাদের সামান্য পরিচয় ঘটেছিল কিন্তু জায়গাটাকে, বিশেষ করে জ্যুইশ কোয়ার্টার এলাকাটাকে আরও খুঁটিয়ে জানার ইচ্ছে থেকেই আমাদের এই ট্যুরে যোগ দেওয়া।
যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখি গাইড আরও জনাকয়েক পর্যটক পরিবেষ্টিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি একজন পোলিশ ইহুদি তরুণ, প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করছেন, নাম মিখায়েল। প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ করে তিনি আমাদের সামনে প্রাগের ইতিহাস নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। সেই মধ্যযুগ থেকে শুরু করে প্রথমে বিভিন্ন রাজতন্ত্র, তারপর প্রজাতন্ত্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের প্রাগ দখল, তারপর দীর্ঘ কম্যুনিস্ট শাসন এবং সেই শাসনের অবসান, দেশ বিভাজন এই সব মিলিয়ে ইতিহাসটা একটু লম্বাই হয়ে গিয়েছিল। গাইডের বক্তব্য শেষে শুরু হল ওল্ড টাউনের মধ্য দিয়ে আমাদের পথচলা।

প্রথম দ্রষ্টব্য 'পাউডার টাওয়ার।' পুরোনো প্রাগ শহরের যে তেরোটি প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল, তার মধ্যে এটি একটি। ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে গথিক শৈলীর টাওয়ারটি তৈরির কাজ শেষ হয়। কোনও এক সময় বারুদ মজুত করার জন্য এটি ব্যবহার করা হত, তাই এর নাম 'পাউডার টাওয়ার।' চেক রাজাদের রাজ্যভিষেকের সময় শোভাযাত্রা এই পথেই পুরোনো শহরে ঢুকত। এর পরে 'চার্চ অফ সেন্ট জেমস', 'কিউবিস্ট হাউস', 'স্ট্যাচু অফ ব্ল্যাক ম্যাডোনা', যেখানে মোজার্টের দুটি অপেরার প্রিমিয়ার হয়েছিল সেই 'এস্টেট থিয়েটার' ইত্যাদি দেখার পরে এসে পড়লাম ওল্ড টাউন স্কোয়ার অঞ্চলে। মিখাইলের কাছে শুনে নিলাম এই অঞ্চলের কিছু কিছু বাড়ির পিছনের ইতিহাস। তবে আমার খুব ভাল লাগল এই ওল্ড টাউন স্কোয়ারের এক প্রান্তে অবস্থিত সতেরো নম্বর বাড়িটির সামনে লাগানো ফলকটি দেখে। এলাকার অন্যান্য বাড়ির তুলনায় নিতান্তই সাদামাটা

পাউডার টাওয়ার

দেখতে এই বাড়িটি এক সময় ছিল মিসেস বেরটা ফ্যাণ্টা-র সালোঁ, যেখানে কাফকা, ম্যাক্স ব্রড এবং প্রাগের সেই সময়কার আরও অন্যান্য জার্মানভাষী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা দিতে আসতেন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা যিনি নতুন করে লিখেছিলেন, সেই আলবার্ট আইনস্টাইন আর আড্ডার পাশাপাশি তাঁর বেহালায় বাজিয়ে শোনাতেন মোজার্টের সুর। এর পরে ওল্ড টাউন স্কোয়ারকে পেছনে রেখে আমরা চলে এলাম প্রাগের জ্যুইশ কোয়ার্টারে। অঞ্চলটির সূত্রপাত ত্রয়োদশ শতকে, যখন এই জ্যুইশ কোয়ার্টার বা 'জোসেফব' এলাকাটি ছাড়া শহরের অন্য কোথাও ইহুদিদের বসবাস করার অনুমতি ছিলনা। ব্যাপক পুনর্নির্মাণের ফলে সামান্য কয়েকটি সিনাগগ এবং স্মৃতিসৌধ ছাড়া এলাকাটি এখন আর আসল চেহারায় নেই। নাৎসি অধিগ্রহণের সময় এই কয়েকটি জিনিস ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়, কারণ হিটলার চেয়েছিলেন যে "ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে এমন একটি জাতির জাদুঘর" হিসেবে এই স্মারকগুলি অক্ষত থাকুক।

চার্লস ব্রিজ

আমাদের ট্যুর শেষ হল চার্লস ব্রিজের সামনে এসে। পাথরের তৈরি সেতুটি সম্ভবত প্রাগের সবচেয়ে বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক। ভ্লাতেভা নদীর ওপর এই সেতুটি একসময় ছিল প্রাগ দুর্গ এবং শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা। দিনের অধিকাংশ সময় ব্রিজটি পর্যটক, হকার, বাজনদার, ছবি আঁকিয়ে ইত্যাদি নানাবিধ মানুষজনের ভিড়ে এতটাই ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে যে পায়ে হেঁটে একে পারাপার করা এক দুঃসাধ্য কাজ। ব্রিজের দুইপাশে সারিবদ্ধ ভাবে রাখা আছে প্রায় তিরিশটি মূর্তি,যার কয়েকটির মনস্কামনা পূর্ণ করার ক্ষমতা আছে বলে শোনা যায়, কাজেই সেগুলোর সামনে প্রচুর জনসমাবেশ। তবে মূল মূর্তিগুলি এখন স্থান পেয়েছে জাতীয় সংগ্রহশালায়,পর্যটকেরা ব্রিজের ওপর যে মূর্তিগুলি সজ্জিত দেখেন,সেগুলো সবই প্রতিকৃতি। চার্লস ব্রিজের ওপর দেখা থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য নাকি বড়ই সুন্দর, কিন্তু সেটা দেখতে হলে রাত ন'টা-দশটা অবধি অপেক্ষা করতে হবে, সুতরাং আমরা চলে এলাম আবার জ্যুইশ কোয়ার্টারে স্প্যানিশ সিনাগগ দেখতে। স্প্যানিশ সিনাগগ নামকরণের পেছনে রয়েছে সৌধটির স্থাপত্যে মূলত মূরিশ বা স্প্যানিশ স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব। উজ্জ্বল সোনালি,

সবুজ, নীল এবং লাল রঙের ব্যবহারে সজ্জিত হয়েছে সিনাগগটির ভিতরের দর্শনীয় অলংকরণ, যে কারণে এটিকে ইউরোপের সবচাইতে সুন্দর সিনাগগ বলা হয়ে থাকে। প্রাগ শহরে ওটিই ছিল আমাদের শেষ দ্রষ্টব্য।
দুর্গ আর প্রাসাদের গায়ে লেখা এক হাজার বছরের ইতিহাস, চার্চের সুসজ্জিত অন্দরমহল, পাথরে বাঁধাই করা রাস্তার ওপর শকটের অশ্বক্ষুরধ্বনি, মধ্যযুগীয় থেকে অত্যাধুনিক - শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য অট্টালিকায় অনুপম স্থাপত্যশৈলীর অনবদ্য ঐকতান,জনবহুল রাস্তায় বাদ্যযন্ত্রে সুরের মূর্ছনা তুলতে থাকা শিল্পী,শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা নদী,পথের ধারের সরাইখানাগুলোতে বিখ্যাত চেক বিয়ারের আস্বাদ-গ্রহণরত পর্যটকদের উপচে পড়া উচ্ছল উপস্থিতি -সব মিলিয়ে প্রাগ ইউরোপের এক বর্ণময় এবং প্রাণোচ্ছল শহর। লণ্ডন, প্যারিস বা রোমের মত নামডাক না থাকলেও এই শহরের একটা অনন্য চরিত্র রয়েছে, যা ভ্রমণকারীদের মনকে ছুঁয়ে যাবেই যাবে। প্রাগ ঘুরে দেখার এক সুন্দর অভিজ্ঞতা মনে সঞ্চিত রেখে পা বাড়ালাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে।

প্রাগের পথে ট্রাম

~ *প্রাগের আরও ছবি* ~

আই.আই.টি. খড়গপুরের প্রাক্তনী কণাদ চৌধুরীর পড়াশোনা এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। পরবর্তী সময়ে কর্মজীবন কেটেছে ভারতের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থায়। অবসরজীবন কাটছে বেহালা বাজিয়ে,নানান ধরণের গানবাজনা শুনে,বই পড়ে,ফেসবুকে টুকটাক লিখে এবং সুযোগ পেলে একটুআধটু বেড়িয়ে। ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখালেখির জগতে প্রথম পদক্ষেপ 'আমাদের ছুটি'র আঙিনাতেই।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

ভরতপুরে একদিন

সূর্যাশিস পাল

~ ভরতপুরের আরও ছবি ~

শুক্রবার এমনিতেই অফিসে ঠিক মন বসে না। তারপর যখন সায়ন ভরতপুর ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা পেড়ে বসলো তখন উৎসাহের আর সীমা রইল না। শুক্রবারটা কাটলো বেড়িয়ে আসবার প্রস্তুতিতেই। রাত বারোটা নাগাদ একটি গাড়ি করে বেরিয়ে পড়লাম ভরতপুরের জন্য। আসা যাওয়ার মোট গাড়ি ভাড়া ৩৫০০-৪০০০ টাকা লাগবে। অবশ্য টোল ট্যাক্স মিলিয়ে টাকার অঙ্কটা আরও অনেকটাই ফেঁপে ওঠে। তাই আমার পরামর্শ হল যে ভরতপুর যেতে হলে ট্রেনে কিংবা বাসে যাওয়াই শ্রেয়। দিল্লি থেকে ভরতপুর পৌঁছাতে লাগে প্রায় তিন-চার ঘন্টা। ভরতপুর পৌঁছলাম যখন, সকাল হয়নি। তাপমাত্রা প্রায় চার-পাঁচ ডিগ্রি। চারিদিক কুয়াশার চাদরে ঢাকা। কিছুক্ষণ গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে নিলাম। সফরের ক্লান্তি নিমেষেই ঝরে পড়ল। সূর্যের প্রথম আলোর সঙ্গেই শুরু হল ভরতপুর ভ্রমণ।

রাজস্থান আর উত্তরপ্রদেশের মাঝখানে অবস্থিত ভরতপুরের প্রধান আকর্ষণ এখানকার পাখিরালয় কিংবা বার্ড স্যাংচুয়ারি। ২৯ বর্গকিমি ব্যাপ্ত এই বার্ড স্যাংচুয়ারি ছিল রাজা রাজড়াদের শিকারভূমি। পরে ১৯৭৬ সালে জায়গাটিকে ভারত সরকার পাখিরালয় হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৮৫ সালে এটিকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকায় যোগ করা হয়। প্রথমে এর নাম দেওয়া হয় ঘানা বার্ড স্যাংচুয়ারি। পরে নাম পরিবর্তন করে "কেওলাদেও" রাখা হয়। এই নাম রাখার পেছনেও একটি কাহিনি আছে। এই ন্যাশনাল পার্কের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটি শিবমন্দির আছে। সেই শিবমন্দিরের মূর্তি পাওয়া গেছিল একটি কলাগাছের নিচে, সেই থেকে দেবতার নাম এবং পার্কের নাম দুটিই "কেওলাদেও" অর্থাৎ কলার দেবতা। বিখ্যাত পক্ষীবিদ সালিম আলি এই পাখিরালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পার্কের ভেতরে তাঁর নামাঙ্কিত একটি "ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার" আছে।

যাকগে আমাদের গল্পে ফিরে আসা যাক। পাখিরালয়ের টিকিট কিনে এবং রিক্সা ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম বিহঙ্গ দর্শনের জন্য। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে ভরতপুরে পাখি দেখার সব চেয়ে ভালো সময় কিন্তু শীতের মরসুমে। কারণ এই সময়েই দেশদেশান্তর থেকে পাখিরা এখানে অতিথি হয়ে আসে। আবার কয়েক মাস পরে ফিরে চলে যায়। ভালো ক্যামেরা থাকলে দেখার আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যদি এখানে কিছুদিন থেকে যেতে চান তাহলে রাজস্থানের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গেস্ট হাউস আছে ন্যাশনাল পার্কের অভ্যন্তরেই আর পার্কের সীমানার ঠিক বাইরে ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশেই আছে রাজস্থান ট্যুরিজমের লজ। আলাদা করে গাইড নেওয়ার দরকার নেই, পার্কের ভিতরে ঘোরাফেরার জন্য সাইকেল রিক্সা ভাড়া করা যায়। সেই রিক্সাচালকরাই আপনাকে বিভিন্ন পাখির নাম,তারা কোন দেশ থেকে এসেছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে দেবেন।

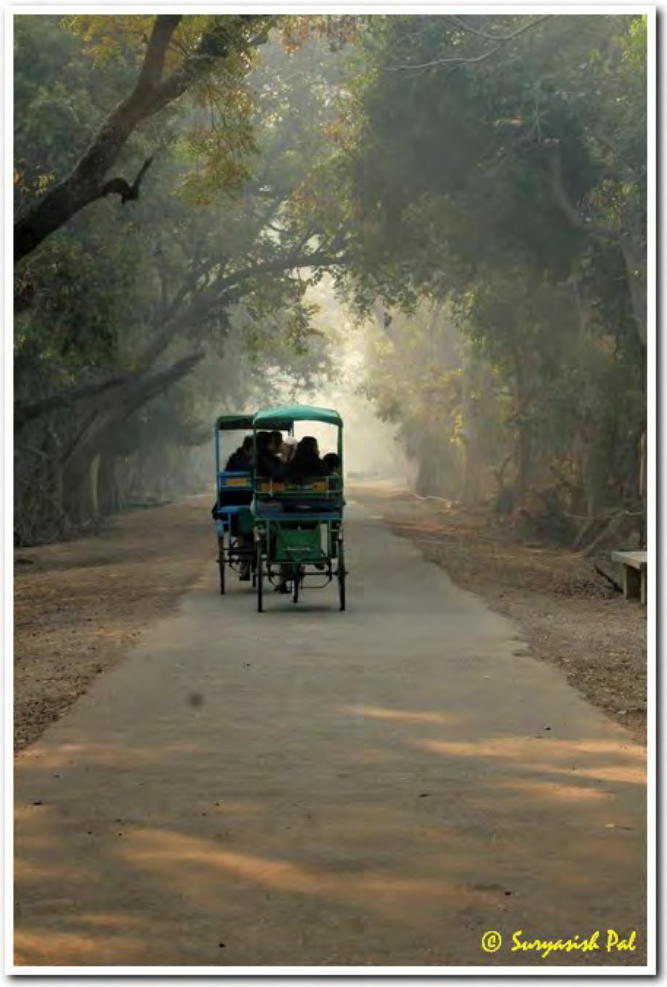

চোখ,কান খোলা রাখলে দেখতে পাবেন বিভিন্ন রকমের বক, সারস, হাঁস, পেলিক্যান,ইন্ডিয়ান হর্নবিল,টাইগার বার্ড,প্যারাকিট, নীলকণ্ঠ, ওরিয়েন্টাল ম্যাগপাই রবিন ইত্যাদি ছোট বড় নানা প্রজাতির পাখি।

পাখিরালয়ের ভিতরে ঘন জঙ্গল, বিস্তীর্ণ ঘাসজমি ছাড়াও বড় বড় জলাভূমি আছে। তাই এখানে ডাঙার পাখি ও জলের পাখি দুই-ই দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও অজগর,হরিণ,জংলি শুয়োর,নীল গাই, সম্বর, হায়না এবং শিয়াল চোখে পড়তে পারে। আর রাজস্থানের সর্বত্রই তো ময়ূর দেখা যায়। একদা ভরতপুরের প্রধান আকর্ষণ ছিল সাইবেরিয়ান ক্রেন, কিন্তু গত অনেক কাল যাবৎ তারা আর এদেশে আসছে না। তবে ইন্ডিয়ান সারস ক্রেনের আকর্ষণও নেহাত কম নয়। কয়েক ঘন্টা পাখিরালয়ে কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম ভরতপুরের অন্য আকর্ষণগুলো দেখতে।

ভরতপুর স্বাধীনতার আগে ছিল হিন্দু জাঠ রাজাদের অধীনে। এই জাঠ রাজারা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে। এদের মধ্যে সব চেয়ে পরাক্রমী রাজা ছিলেন রাজা সুরজমল। এইসব এখন ভুলে যাওয়া ইতিহাস। তার ছোঁয়া পাওয়া যায় ভরতপুরের লোহাগড় দুর্গে। দুর্গের মধ্যে যে মিউজিয়ামটি আছে সেটা শুধু সুন্দরই নয়, নিরিবিলিও। কুড়ি টাকার টিকিট কিনে দেখে নিলাম জাঠ রাজাদের অস্ত্র-শস্ত্র ,পোশাক-আশাক ইত্যাদি নানা সাজ-সরঞ্জাম। প্রায় ঘন্টা দুয়েক এখানে থেকে দিল্লি ফেরার পথ ধরলাম।

~ *ভরতপুরের আরও ছবি* ~

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সূর্যাশিস পাল বর্তমানে নয়ডার একটি সফটওয়্যার ফার্মে কর্মরত। অবসর সময়ে গল্প-কবিতা লিখতে এবং পড়তে ভালোবাসেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher